প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬.৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ ১ আষাঢ় ১৩৫১
পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৩৫৩

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

নাম ও রূপ

জগতে বস্তুতে বস্তুতে যে পার্থক্য রহিয়াছে— রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে যে একটা বৈচিত্র্য রহিয়াছে— তাহা যদি না থাকিত তবে সেই বৈচিত্র্যবিহীন জগতে বাস করিতে কেমন লাগিত, কে জানে। তেমনই, এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের বিবিধ বস্তুর সম্বন্ধে সব মানুষেরই যদি মত এক হইয়া যাইত, তাহা হইলে সেই মতানৈক্যহীন জগতে ভাবুক ও বুদ্ধিমানের কেমন ঠেকিত, তাহাই বা কে জানে। সৌভাগ্যক্রমে এই সব কাল্পনিক প্রশ্নের উত্তরের চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন; কেননা, জগতে বস্তুর বৈচিত্র্যও আছে এবং মতের বৈচিত্র্যও কম নয়। অন্য অনেক বিষয়ে যেমন সকলের মত এক নয়, তেমনই দর্শন কাহাকে বলে, তাহা লইয়াও এখন পর্যন্ত সব দার্শনিক একমত হইতে পারেন নাই। দর্শনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতি ও ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধেও ওই একই কথা। "নানা মুনির নানা মত" প্রভৃতি উক্তি এই মতভেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

দর্শনের রূপ নির্ণয়ে যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা প্রধানত তিনটি কারণের উপর নির্ভর করে। প্রথম, রুচিবৈচিত্র্য; দ্বিতীয়ত, কালভেদ; আর তৃতীয়ত, দেশভেদ। দর্শন অর্থে মোটামুটি কতকগুলি আলোচ্য বিষয়ের সমষ্টি ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু পূর্বোক্ত তিন কারণে এই সব আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য প্রবেশ করে। দেশে দেশে যে প্রভেদ রহিয়াছে— সাহারা ও মেরুপ্রদেশ, কাশ্মীর ও সিংহল, ইউরোপ ও পূর্ব-এশিয়া প্রভৃতিতে যে তফাত রহিয়াছে— তাহার দরুন সেই সেই জায়গার লোকদের জীবনের অনুভূতি ও জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন হইয়া

থাকে। ইহাদের সকলের সমস্যা এক নয়, সৌন্দর্যবোধ এক নয়, এবং মূল্যবোধও এক নয়। তেমনই একই দেশেও এক এক যুগে এক-একটা জিনিস মানুষের কাছে বড়ো হইয়া উঠে। তাহার জন্য তাহার দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া যায়। ভারতবর্ষের আর গ্রীসের দর্শনের যদি তুলনা করি— এমন কি, উভয় দেশের সমসাময়িক দর্শনেরও যদি তুলনা করি, তবে দেখা যাইবে, উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে। উভয়ের আলোচ্য প্রশ্নও সব সময় এক নয়, উভয়ের উত্তরও ঠিক এক নয়। একটা সহজ দৃষ্টান্ত এই যে, ভারতীয় দর্শনে মোক্ষের কথাটা যত বড়ো, গ্রীক দর্শনে তত নয়; আর গ্রীক দর্শনে রাষ্ট্র যত বড়ো স্থান দখল করিয়াছে, ভারতের দর্শনে তাহা করে নাই।

আবার, কালভেদেও দর্শনের রূপ বদলাইয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসের আর বর্তমান ইউরোপের দার্শনিক সমস্যা এক নয়। মধ্যযুগে— অথবা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত— ইউরোপে মোটামুটি যেসব প্রশ্ন প্রবল ছিল, ষোড়শ শতাব্দী হইতেই সেগুলি ক্রমশ নিষ্প্রভ হইয়া যায়; এবং নূতন প্রশ্ন অথবা পুরাতন প্রশ্নের নূতন রূপ দেখা দিতে আরম্ভ করে। বর্তমান জগতে সব দেশেই মানবের স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য— ব্যক্তির এবং জাতির উভয়েরই সর্বাঙ্গীণ ঐহিক সৌভাগ্য— যত বড়ো প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছে তেমন আর কিছু নয়। আজ মানবসমাজের পুনর্গঠনের কথাটা অত্যন্ত বড়ো হইয়া পড়িয়াছে। এই সব চিন্তনীয় বিষয় দার্শনিক যে শুধু অবহেলা করিতে পারেন না, তাহা নয়; এই সব তাঁহারই প্রশ্ন। এই ভাবে কালভেদে— মানবসমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে— দর্শনেরও রূপ পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

তাহা ছাড়া, ব্যক্তির রুচিভেদেও অনেক সময় ভেদ সৃষ্টি করে। দর্শনের জিজ্ঞাসা অনেক— বহু প্রশ্ন তাহার এলাকায় পড়ে। কিন্তু সকল দার্শনিকই

একই বিষয়ে তাঁহাদের চিন্তা কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখেন না। আবার, বিষয়বস্তু যেমন পৃথক্ হইতে পারে, তেমনই বিবেচনার ভঙ্গীও সকলের এক হয় না। কাহারও জগৎ ঈশ্বর-সৃষ্ট, কাহারও মতে জগৎ জড় পরমাণু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; কাহারও মতে আত্মা অবিনশ্বর, আর কাহারও মতে আত্মা নাই। এই সব ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং পূর্ব-প্রতিজ্ঞা অনুসারে চিন্তাধারা পৃথক্ হইয়া যায়। সুতরাং ব্যক্তির রুচিবৈচিত্র্য অনুসারেও পৃথক্ পৃথক্ দর্শনের উৎপত্তি হয়।

তবে কি এই বহুরূপী বস্তুটির সাধারণ কোনো রূপ নাই, যাহা আশ্রয় করিয়া একে অন্যের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারে? বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা সাধারণ সাম্য থাকিতে পারে। বনের প্রত্যেকটি বৃক্ষ অপরটি হইতে ভিন্ন এবং ভিন্ন ভাবেই তাহাকে আমরা দেখি; তথাপি বৃক্ষ মাত্রেই এক জাতির অন্তর্গত এবং জাতির সাধারণ গুণ সকলের মধ্যেই আছে। এই সকল গুণের দ্বারাই বৃক্ষ-ভিন্ন বস্তু হইতে বৃক্ষকে পৃথক্ করা যায়। ঠিক তেমনই দর্শনে দর্শনে পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু তথাপি দর্শন মাত্রেরই কতকগুলি সাধারণ বিশেষণ আছে যাহা দ্বারা দর্শন-ভিন্ন বস্তু হইতে দর্শনকে পৃথক্ করা যায়। আর, এই পৃথক্-করণের দ্বারাই দর্শনের সাধারণ রূপ অনেকটা নির্ণীত হইয়া থাকে।

দর্শন কি দুর্বোধ হেঁয়ালি?

দার্শনিকের ভাষা অনেক সময় দুর্বোধ হয়, তাহা মানি। বিদ্যা এবং বুদ্ধির উচ্চস্তরে উন্নীত লোকদের জন্যই দার্শনিকেরা কথা বলেন; সেইজন্য নিজেদের বক্তব্য সহজ ভাষায় প্রকাশ করা তাঁহারা অনাবশ্যক মনে করেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান দার্শনিকদের অনেকেরই ভাষায় এই দোষ আছে। কিন্তু ভাষা যে কারণে যতই দুর্বোধ হউক না কেন, দর্শনের

বিষয়বস্তু কখনও রহস্যাবৃত ইন্দ্রজাল কিংবা প্রহেলিকা নয়। ইহা সাধারণে প্রকাশিত এবং প্রকাশ্যে আলোচিত হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। শুধু দীক্ষিতের নিকট প্রকাশিতব্য গুরুর মন্ত্রের মতো ইহা গুহ্য জিনিস নয়। কোনো ক্ষেত্রে কখনও দর্শন এই রূপে দেখা দিয়া থাকিলেও বর্তমানে আর তাহার এই রূপ নাই। গ্রীক দার্শনিক সোক্রেতিসের সম্বন্ধে একটা প্রচলিত উক্তি এই যে, তিনি দর্শনকে স্বর্গ হইতে মর্ত্যে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন। ইহার অর্থ তাঁহার সময় হইতে দার্শনিক আলোচনা সাধারণের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দর্শন সম্বন্ধে এ কথা এখনও সত্য।

অনেক সময় স্থলবিশেষে অধ্যাত্মবিদ্যা বলিয়া যাহা গৃহীত ও প্রচারিত হয়, তাহা আর যাহাই হউক, দর্শন নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম অনুক্ত রাখিয়া একখানি গ্রন্থ হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :

"সত্যাগ্রহী তখন ইষ্টে অধিকতর অভিনিবিষ্ট হইয়া দেখিতে পান, মণিপুরের সোনালী লাল ঘন লালে পর্যবসিত হইতেছে; মণিপুরচক্র ভেদ করিয়া ছোট ঘণ্টাধ্বনির মতো ক্লীং-শব্দ নূতন জগৎ রচনা করিতেছে।...

"সত্যাগ্রহী আত্ম-সংস্থিতির এই চতুর্থ কেন্দ্রের আর এক ধাপ ঊর্ধ্বে আরোহণ করিতে প্রয়াসশীল হইলে আপন মস্তিষ্ককোষে এবং পেশীকোষে চলন-ধাক্কা অনুভব করেন এবং এই অনুভূতি হইতে হং-যোক নূতনতর জগৎ লইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হয়।...

"সত্যাগ্রহী সহস্রদলকমল উত্তীর্ণ হইলে পুনরায় আকাশের দর্শন লাভ করেন। এই জ্যোতির্ময় আকাশে নীল সূর্যের অভ্যুদয় হয়। ওই সূর্যের রশ্মিজাল হইতে ওঁ-শব্দ নির্গত হইয়া চারিদিকে বিসর্পিত হইতে থাকে।..." ইত্যাদি।[১]

---

১ তুলনা—"ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।" ইত্যাদি।
রবীন্দ্রনাথ : "হিংটিং ছট্", 'সোনার তরী'।

এই গভীর তত্ত্ব-বিতরণে বিদ্যা এবং অবিদ্যা, অন্ধবিশ্বাস এবং নিষ্ঠুর পরিহাস সমান পরিমাণে মিশ্রিত রহিয়াছে। ইহাকে আর যে কোনো নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, 'দর্শন' নাম ইহার প্রাপ্য নহে।

এইপ্রকার বিদ্যার সঙ্গে দর্শনের সাদৃশ্য অতি সামান্যই। কিন্তু আরও অনেক বিদ্যা ও বিষয় আছে যাহাদের সঙ্গে দর্শনের সাদৃশ্য অনেক। দর্শনের রূপ বুঝিতে হইলে সে সকল হইতে দর্শনের প্রভেদ কোথায়, জানা দরকার। বিশেষত বিজ্ঞান ও ধর্ম এই দুইটির সহিত দর্শনের সম্বন্ধ— সাদৃশ্য ও প্রভেদ— ভালো করিয়া অনুধাবন করা প্রয়োজন।

দর্শন ও বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে উত্তেজনা, উচ্ছ্বাস, কবিকল্পনা, সুখদুঃখের আবেগ প্রভৃতি ব্যক্তিগত অনুভূতির কোনো জায়গা নাই। আমাদের ভালো লাগা-না-লাগা দিয়া বিজ্ঞানের সত্য নির্ধারিত হয় না, সুন্দর-অসুন্দর দ্বারা কিংবা প্রেম ঘৃণা দ্বারাও নয়। বিচার দ্বারা নির্ণয় করা যায় এমন সত্যই বিজ্ঞানের সত্য; পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায়, যুক্তি দ্বারা অন্যকে বুঝানো যায়— এমন সত্যই বিজ্ঞানের সত্য। শাস্ত্র কিংবা গুরূপদেশের স্থান বিজ্ঞানে নাই। বেদে-কোরাণে আছে বলিলেই বিজ্ঞান মানিবে না, নাই বলিলেও অস্বীকার করিবে না। কেহ যদি পুরাণ ও বাইবেলে পৃথিবীর যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা মানিয়া বর্তমান ভূগোল অস্বীকার করেন, তবে তিনি অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধীন; অথবা কেহ যদি নাড়ীতে হাত দিয়াই রোগী কী খাইয়াছে কিংবা লোহার কারখানায় কাজ করে কিনা বলিতে সাহস করেন, তবে তিনিও বিজ্ঞান-বিরোধী।

বিজ্ঞানের জ্ঞান সমগ্র— প্রত্যেকটি সত্য প্রত্যেকটির সঙ্গে সম্বদ্ধ।

বিজ্ঞানের সত্য সনাতন— সব সময়েই সত্য এবং সার্বত্রিক— সব জায়গায় সত্য। বিজ্ঞান অতীত জানে, কার্যকারণের শৃঙ্খল হইতে ভবিষ্যৎও জানিতে পারে। সেইজন্য বিজ্ঞানে একপ্রকার ভবিষ্যদ্বাণীর স্থানও রহিয়াছে ; যেমন, আগামীতে কবে চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণ হইবে, তাহা বিজ্ঞান বলিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া নাড়ী ধরিয়া রোগীর ভূত ভবিষ্যৎ সবই জানিতে পারে না।

শাস্ত্র কিংবা সাম্প্রদায়িক মতবাদ কিংবা কাব্যের উচ্ছ্বাস না মানিয়া শুধু বিচার দ্বারা যে সত্য-সমষ্টি পাওয়া যায় তাহারই নাম বিজ্ঞান। এই ক্ষেত্রে দর্শন ও বিজ্ঞান এক। সত্যনির্ণয়ে দর্শনও বিচার ভিন্ন আর কিছু মানিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদও রহিয়াছে।

জলের ঢেউ কিংবা বুদ্বুদ জল হইতে পৃথক্। ঢেউ না থাকিলেও জল থাকিতে পারে, কিন্তু জল ছাড়া ঢেউ হয় না। ঢেউ অসত্য নয় কিন্তু পারমার্থিক সত্তাও নয়। ঢেউয়ের তুলনায় জল পারমার্থিক সত্তা। তেমনই জল, স্থল, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি দৃশ্য জগতের অঙ্গ অসত্য না হইলেও পারমার্থিক সত্য কিনা সন্দেহ করা চলে। ইহারাও জলের আশ্রয়ে ঢেউয়ের মতো একটা মহত্তর সত্তার আশ্রয়ে উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে। দর্শন এই সম্ভাবনাটা স্বীকার করিয়া চলে। এই পারমার্থিক সত্তার অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়— বিচারগম্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন কোনো বস্তু বিজ্ঞান যে স্বীকার করে না, তাহা নয় ; বিজ্ঞানের পরমাণুই ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বাহিরে। কিন্তু তথাপি এক্ষেত্রে যে বিচারগম্য সত্তার অস্তিত্ব দর্শন মানিতে চায়, সে জিনিস সেভাবে স্বীকার করার প্রয়োজন বিজ্ঞান অনুভব করে না। এইখানেই দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটা প্রভেদ আসিয়া পড়ে।

তাহা ছাড়া, উভয়ের ক্ষেত্রও সমান নয়। সমগ্র জগৎটাকে একটা আপস-বাটোয়ারা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভোগদখল

করে; একে অন্যের ক্ষেত্রে কদাচিৎ পদার্পণ করে। জগতের মধ্যে জড় ও চেতন একটা বড়ো প্রভেদ। জড়-অংশ জড়-বিজ্ঞানের অধিকারে আছে, সেই উহার বিচার আলোচনা করে এবং তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করে। আর, চেতন-অংশের বিচারের ভার অন্য বিজ্ঞানের উপর ন্যস্ত আছে। প্রাণিতত্ত্ব ও পদার্থতত্ত্ব এক নয়— প্রাণিবিজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞানও ভিন্ন বস্তু। এইভাবে জগতের বিভিন্ন অংশ লইয়া বিবিধ এবং বহুবিধ বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে।

কিন্তু দর্শনের কোনো অংশী নাই। সমগ্র বিশ্ব— জড়, চেতন ও অধ্যাত্ম— তাহার অধিকারে রহিয়াছে এবং সমগ্র হিসাবেই সে উহার বিচার করিয়া থাকে, অংশ ভাগ করিয়া নয়। অংশ লইয়া বিচার করিয়া বিভিন্ন বিজ্ঞান যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, সে সকলের সাহায্য দর্শন গ্রহণ করে; কিন্তু দর্শন বিশ্বকে সমগ্র হিসাবেই দেখে। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে অবহেলা সে করে না, কিন্তু বিনাবিচারে গ্রহণও করে না। বিজ্ঞানের বিবিধ সিদ্ধান্তসমূহের সমন্বয় দ্বারা চূড়ান্ত পারমার্থিক সত্যকেই দর্শন জানিতে চেষ্টা করে।

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হইতেই দর্শনের বিচার আরম্ভ হয়। কিন্তু দর্শন নির্বিচারে সে সকল সিদ্ধান্ত মানিয়া লয় না; অনেক ক্ষেত্রেই পুনর্বিচার দ্বারা সে সকলের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া লয়। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। জগতে জীবের আবির্ভাব সম্বন্ধে ক্রমবিকাশ অনুসারে একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়াছে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের এবং ভিন্ন ভিন্ন আকারের প্রাণবন্ত দেহ জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছে। বিজ্ঞান এই পর্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হয়। এই যে ক্রমশ প্রকাশিত বিরাট নাট্য, ইহাতে কোনো নাট্যকারের নিপুণ হস্তের

চতুর স্পর্শ কোথাও রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করার প্রয়োজন বিজ্ঞান অনুভব করে না। কিন্তু দর্শন বিজ্ঞানের বিশদ এবং শ্রমবহুল অনুসন্ধান অস্বীকার না করিয়া৹ অধিকন্তু ইহা বলিতে চায় যে, জীবের আবির্ভাব এবং বিকাশ শুধু অচেতন প্রকৃতির সাহায্যেই হয়তো হয় নাই; ধর্মে ঈশ্বর নামক যে আর একটি সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে তাহার কর্তৃত্বও ইহাতে রহিয়াছে। এইখানে দর্শন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে, অথচ তাহার একটু উর্ধ্বেও উঠিয়াছে। দর্শন-বিজ্ঞানের সম্পর্কের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও রহিয়াছে।

ইহা ছাড়া, দর্শনে সত্যের মাপকাঠিও একটু পৃথক্। বিজ্ঞানের নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যই সত্য; কিন্তু দর্শনের চোখে দৃশ্যত সত্য এবং পারমার্থিক সত্যের মধ্যে একটা প্রভেদ ধরা পড়ে। বিজ্ঞান পরিদৃশ্যমান জগতকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লয় এবং তাহাই লইয়া তাহার কারবার। কিন্তু দর্শনের বিচারের কষ্টিপাথরে তাহাই চূড়ান্ত সত্য নয়। গোটা জগৎটা সত্য না মায়া, বাস্তব না অলীক, সে বিচারের স্পর্ধাও দর্শন রাখে। তাহার ফলে অনেক সময় এমন হইয়াছে যে, যে জগৎ লইয়া সাধারণ মানুষের জীবনের কাজ চলে, সে জগৎটা নিতান্তই ফাঁকি বলিয়া দার্শনিকের মনে হইয়াছে। জগৎ সত্য নয়— ইহাই তখন চরম সত্য হইয়া দাঁড়ায়। উভয়েই সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকিলেও দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে এই একটা বড়ো তফাত। উভয়ের সত্য মাপিবার পরিমাপক এক নয়।

অবশ্যই দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে এই যে প্রভেদ, তাহা শুধু সাধারণ ভাবেই সত্য। দর্শন যেমন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া নিজের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে, তেমনই বিজ্ঞানও নিজের সীমা অতিক্রম করিয়া দর্শনে উন্নীত হইতে স্পর্ধা রাখে। ফলে, উচ্চস্তরে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি থাকে না— অনেক সময় থাকেই না। পদার্থবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম আবিষ্কার কিংবা নক্ষত্রবিজ্ঞানের গভীরতম সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রে দার্শনিক সিদ্ধান্তের অনুকূল তো বটেই, সমতুলও হইয়া যায়।

দর্শন ও ধর্ম

বিশ্বই দর্শনের দ্রষ্টব্য বিষয় এবং বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি লইয়া সে সমগ্র বিশ্বকেই বুঝিতে চায়। কিন্তু এই বিশ্বকে বুঝিবার চেষ্টা মানুষ আরও অনেক রকমে করিয়াছে। এই বিশ্ব কোথা হইতে আসিয়াছে, কে উহাকে রক্ষা করিতেছে, এবং কী ভাবে, এই সব প্রশ্নের উত্তর ধর্মশাস্ত্রও দিয়া থাকে। ঈশ্বর স্বর্গ মর্ত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে আলোর আবির্ভাব হইয়াছিল এবং দিনরাত্রের প্রভেদ হইয়াছিল। জল, স্থল, ভূচর, খেচর ও জলচর জন্তু এবং সর্বোপরি মানুষ, তিনিই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে এইসব বৃত্তান্ত আমরা পাই। শুধু বাইবেলে নয়। সকল দেশের ধর্মশাস্ত্রেই অনুরূপ উক্তি রহিয়াছে। জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং পরিণতি— সমগ্র সৃষ্টি— স্রষ্টার ক্রিয়া হিসাবে ধর্মশাস্ত্র বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের এইসব সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান এবং দর্শন উভয়েই অনেক জায়গায়ই মানিতে অক্ষম। আধুনিক বিজ্ঞানের বিচারে ধর্মশাস্ত্রে কথিত সৃষ্টি-ক্রম প্রভৃতি অনেক বিষয়ই অসত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। আর, সে সব ক্ষেত্রে দর্শন সাধারণত বিজ্ঞানেরই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বাইবেলে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির যে বিবরণ দেওয়া আছে, তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। বাইবেলের মতে ছয় দিনে এই চরাচর সৃষ্টি শেষ করিয়া সপ্তম দিনে ভগবান বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ভগবানেরও পরিশ্রমের পর মানুষেরই মতো বিশ্রাম দরকার হয় কি না, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। কিন্তু ছয় দিনে— অর্থাৎ নিজের অক্ষ-রেখার চারিদিকে ছয় বার ঘুরিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে তাহারই ভিতর— গোটা ব্রহ্মাণ্ড, শুধু পৃথিবী নয়, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র-সমেত সমস্ত বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া গিয়াছিল, এ কথা আজিকার বিজ্ঞান মানিতে পারে না। উল্কাপিণ্ডের মতো সূর্য হইতে খসিয়া পড়িয়া ঠাণ্ডা হইতে

এবং ক্রমশ জমাট বাঁধিয়া জলে স্থলে বিভক্ত হইতেই এই পৃথিবীর ছয় দিনের চেয়ে ঢের বেশি সময় লাগিয়াছিল। তারপর ইহাতে প্রাণের আবির্ভাব হইতে আরও সময় লাগিয়াছে। সুতরাং সৃষ্টিক্রিয়া ছয় দিনে শেষ করিতে ভগবানও পারেন নাই।

তারপর জীবের আবির্ভাব। বাইবেলে পাই, ভূচর, খেচর ও জলচর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জীব ভগবান পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আর, মানুষকে সম্পূর্ণ আলাদা নিজের মূর্তির অনুকরণে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই কাহিনীও আজ বিজ্ঞান নিঃসংকোচে অস্বীকার করিয়াছে। বিজ্ঞানের মতে ভিন্ন ভিন্ন জীবের আবির্ভাব একটা অব্যাহত ক্রমবিকাশ মাত্র। উদ্ভিদ্ ও প্রাণী এবং মানুষ ও ইতর জন্তুর মধ্যে একটা গোত্রের সম্পর্ক রহিয়াছে। সবই একই আদিম প্রাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কী ভাবে, কী কী স্তরে তাহাও বিজ্ঞান বিস্তৃতভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং করিতেছে। এই ব্যাখ্যার মধ্যে অজানা কিছু নাই, এমন নয়; কিন্তু একটা কথা এখন নিশ্চয় এবং নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে সত্য যে, জীবসমূহের এবং উদ্ভিদসমূহের পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি আর বিজ্ঞান মানিতে চায় না।

এই রকম ধর্মগ্রন্থের— শুধু বাইবেলের নয়, হিন্দুদের ও মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্রেরও— অনেক কাহিনী আজ বিজ্ঞান স্পষ্ট এবং নির্ভীক ও অকপট ভাবে অস্বীকার করিতেছে। এই লইয়া ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের একটা কলহ দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অনেক নূতন আবিষ্কার ও সাফল্যের ফলে এই বিবাদ অত্যন্ত ঘনাইয়া উঠে এবং ধর্মের প্রতি বিজ্ঞানের ঔদাসীন্য ও অবহেলা চরমে পৌঁছে। বিজ্ঞানের দম্ভ তখন ঈশ্বরের সিংহাসন কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল।

এই যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের কলহ তাহাতে এই সব প্রশ্নের সম্পর্কে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দর্শন বিজ্ঞানের পক্ষ লইয়াছে। জড়জগতের উৎপত্তি,

জীবের আবির্ভাব প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাখ্যায় দর্শন মোটের উপর বিজ্ঞানের সহিত একমত। কিন্তু জড়-বিজ্ঞান যখন ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে এবং পরমাণু ও অচেতন শক্তির সাহায্যেই বিশ্বের আবির্ভাব বুঝাইতে চেষ্টা করে এবং বিশ্বকে অন্ধশক্তিপরিচালিত একটা যন্ত্রের মতো মনে করিতে চায়, তখন আবার দর্শন তাহার বিরুদ্ধে যায়। প্রতীচীর বিজ্ঞানে— বিশেষত গত দুই শত বৎসরের বিজ্ঞানে যে চিন্তাধারা অত্যন্ত স্পষ্ট তাহা ল-প্লাস্ (La-place) নামক এক বৈজ্ঞানিকের এক উক্তিতে সংক্ষেপে প্রকাশ পাইয়াছিল। এই জগৎ-যন্ত্রে ঈশ্বরের স্থান কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তরে ল-প্লাস বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর নামক পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করা আমার প্রয়োজন হয় নাই।" এই উক্তি অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের সাধারণ উক্তি ; বিশ্বকে বুঝিতে গিয়া, ঈশ্বর স্বীকার করা বিজ্ঞান নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছে। কিন্তু সর্বত্র না হইলেও সাধারণভাবে দর্শন এই মনোভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। ছয় দিনে জগৎ-সৃষ্টি স্বীকার না করিলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা দর্শনের সাধারণ রীতি নয়।

বিজ্ঞান ও ধর্মের কলহের ক্ষেত্রে দর্শন সাধারণত মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে এবং উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করিতে চায়। ফলে হয় এই যে, ধর্মও তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখে না এবং বিজ্ঞানও তাহাকে মনে করে অনাবশ্যক বন্ধু। কিন্তু দর্শন মনে করে, ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়েই একদেশদর্শী— উভয়েতেই সত্য অর্ধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং উভয়ের ভ্রান্তি, ত্রুটি এবং অপূর্ণতা দূর করিলেই পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানের যুক্তি-সিদ্ধ আবিষ্কারের সাহায্যে ধর্মের ভুল সংশোধন করা এবং ধর্মের সূক্ষ্ম অনুভূতি দ্বারা বিজ্ঞানের অপূর্ণতা দূর করা দর্শনের কাজ।

দর্শন ও কলাশিল্প

শিল্পে একটা নির্মাণ— একটা নূতনের সৃষ্টি আছে। কি কাব্যে, কি সংগীতে, কি স্থাপত্য কিংবা ভাস্কর্যে— সকল শিল্পের ভিতরই কল্পনার সাহায্যে শিল্পী এমন কিছুর আবির্ভাব ঘটান, যাহার মতন হয়তো কোথাও কিছু আছে, কিন্তু ঠিক তেমনটি প্রকৃতিতে কোথাও নাই। পুরী কিংবা ভুবনেশ্বরের মন্দির, আগ্রার তাজমহল প্রভৃতি শিল্পীর সৃষ্টি;— শুধু অনুকরণ নয়, নূতন জিনিস। রাফেলের মাতৃমূর্তিও তেমনই দেখিয়া আঁকা নকল নয়— তুলি ও রঙের সাহায্যে একটা নূতন সৃষ্টি। সুর-লয়ে যে সংগীতের উদ্ভব হয়, সেটাও ঠিক কোনো পশু কিংবা পক্ষীর স্বরের অনুকরণ নয়— নূতন সৃষ্টি। কবি যে স্রষ্টা, নূতনের আবির্ভাবক, তাহাও সাধারণ ভাবেই স্বীকৃত। দার্শনিকও কি তেমনই নূতন কিছু সৃষ্টি করেন?

প্রশ্নটা উঠে এইজন্য যে বিভিন্ন কবি কিংবা স্থপতির ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টির মত বিভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন রকমের দর্শন প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। নূতন সৃষ্টি না হইলে একে অন্যের ভিতর এই পার্থক্য আসে কেন। শিল্পের মতো দর্শনেও যে সৃষ্টি রহিয়াছে, তাহা সাধারণ ভাবে সত্য। বিভিন্ন উপাদান একত্র করিয়া তাহাকে একটা পরিস্ফুট আকার দিলে উহা শিল্প হয়; যেমন, খণ্ড খণ্ড পাথর একত্র করিয়া তাজমহল নির্মিত হইয়াছে। তেমনই মানুষের বিচ্ছিন্ন অনুভূতি ও উপলব্ধিকে সমষ্টীভূত করিয়া তাহাকে একটা নূতন রূপ দেয় দর্শন। বিজ্ঞানও তাহাই করে; কিন্তু দর্শনের সৃষ্টি আরও ঊর্ধ্বে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে লব্ধ জ্ঞানের পরিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খল আকার দেয় বিজ্ঞান। ইহারই পূর্ণতর রূপ পাই দর্শনে। ক্ষুদ্র উপাদানসমূহ হইতে একটা বৃহত্তর জিনিস নির্মাণ করে বলিয়া দর্শন ও শিল্পের মধ্যে একটা সাদৃশ্য রহিয়াছে।

কিন্তু উভয়ের সৃষ্টির মধ্যে একটা মস্ত পার্থক্যও রহিয়াছে। শিল্প অবাস্তব

কিংবা কাল্পনিক বস্তুকে অবহেলা করে না; বরং কল্পনার সাহায্য লইয়া বাস্তবকে অতিক্রম করিয়াই সে নূতনের আবির্ভাব ঘটায়। সত্যকার জগতে যাহা আছে তাহাতেই মনকে ষোল আনা আবদ্ধ রাখিলে সংগীতও হয় না, কাব্যও হয় না। কিন্তু দর্শন বস্তুর ভিত্তিতে— সত্যের অটল বনিয়াদের উপর তাহার নির্মাণ প্রতিষ্ঠা করে। 'একটা নূতন কিছু, করা তাহার লক্ষ্য নয়।

ইহা ঠিক যে, কপিল-বাদরায়ণ কিংবা সোক্রেতিস-হেগেলের গবেষণার মধ্যে প্রভেদ রহিয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ এই নয় যে, প্রত্যেকেই একটা নূতন কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। সকলেই এক সনাতন সত্যকেই জানিতে এবং জানাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রভেদ যাহা হইয়াছে তাহা শুধু দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্য হইতে হইয়াছে। যেমন, একই তাজমহলের তিন দিক্ হইতে গৃহীত ছবি তিন রকম দেখায়, ঠিক তেমনই।

শিল্পের সঙ্গে দর্শনের যে প্রভেদ, তাহা কাব্যের বেলায় আরও স্পষ্ট।

দর্শন ও কাব্য

শিল্পের সৃষ্টি যে শুধু নূতনের সৃষ্টি তাহা নয়, উহা সুন্দরেরও সৃষ্টি। প্রকৃত পক্ষে, উচ্চস্তরের যে সব শিল্প, নূতন সুন্দর বস্তুর আবির্ভাব ঘটানোই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু সত্য ও সুন্দরের মধ্যে প্রভেদ আছে। যাহা কিছু সত্য তাহাই সুন্দর নয়; আর, সুন্দর মাত্রেই সত্যও নয়। শহরের স্তূপীকৃত আবর্জনা একটা স্পষ্ট, উপলব্ধ সত্য; কিন্তু কোনো কবিই এখন পর্যন্ত তার মধ্যে সৌন্দর্য দেখিতে পান নাই। আর, "নন্দনবাসিনী উর্বশী"— যে নহে মাতা, নহে কন্যা, নহে বধূ, শুধু সুন্দরী রূপসী— সে অপূর্ব সৌন্দর্যের আধার সন্দেহ নাই, কিন্তু অসত্য; বাস্তবে তাহার ঠাঁই নাই। অবশ্যই, সত্য হইলেই কুৎসিত হইতে হইবে, আর সুন্দর সবই অবাস্তব, এ কথা কেহ বলে না। বাস্তবেতে সুন্দর অসুন্দর দুই-ই আছে, আর সুন্দর যাহা তাহা সত্যও হইতে

পারে, কাল্পনিকও হইতে পারে। যাহা সুন্দর— সত্য হউক, অসত্য হউক— তাহার উপলব্ধিই কাব্য। বাস্তব জগতেও সুন্দর রহিয়াছে। আকাশের ইন্দ্রধনু, ফুলের বর্ণ ও গন্ধ, পাখির গান, সমুদ্রের ঢেউ, পর্বতের উত্তুঙ্গতা— এ সবের ভিতর একটা সৌন্দর্য ও মহিমা আছে, যাহার অনুভূতিতে কবির প্রাণ বীণার তারের মতো বাজিয়া উঠে। এক দিকে কবি যেমন এই সব সৌন্দর্য অনুভব করেন এবং প্রকাশ করেন, তেমনই কল্পনার সাহায্যে নূতন সৌন্দর্য সৃষ্টিও করিয়া থাকেন এবং সমগ্র জগৎকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া দেখিতে চান।

বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি-ভঙ্গী একটু পৃথক্। সুন্দর হউক, কিংবা অসুন্দর হউক, কিছু আসিয়া যায় না— যাহা প্রমাণ-সিদ্ধ সত্য তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করাই বৈজ্ঞানিকের কাজ। কিন্তু এই যে সত্য-লিপ্সা, ইহার সঙ্গে আপাতত কাব্যের বিরোধ দেখা গেলেও, এই বিরোধই শেষ কথা নয়। সত্য হইলেই অসুন্দর হইবে, এমন কোনো নিয়ম নাই। শুধু আপাতদৃষ্টিতে নয়, যাহা চরম সত্য, ভাবুক চিত্তের নিকট তাহা অসুন্দর নয়, বরং পরম সুন্দর ;— ইহাই সত্য-লিপ্সার, বিশেষত দার্শনিকের সিদ্ধান্ত। কবি সৌন্দর্যকেই বড়ো করিয়া দেখেন এবং সৌন্দর্যের সন্ধানে তিনি কল্পনার আশ্রয় লইতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। আর, দার্শনিক সত্যকেই বড়ো করিয়া দেখেন, কিন্তু সুন্দরকে তিনি অবহেলা করেন না এবং সত্য তাঁহার কাছে অসুন্দর নয়।

এইখানেই কবির সঙ্গে দার্শনিকের প্রভেদ। কবি কাল্পনিক সুন্দরেরও উপাসক বলিয়া গ্রীক দার্শনিক প্লেতো (Plato) কবির উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। আদর্শ রাষ্ট্রে তিনি কবিকে জায়গা দিতে চান নাই। তাঁহার প্রধান অভিযোগ এই ছিল যে, কবি কল্পনা-বিলাসী সুতরাং সত্যবিদ্বেষী। কবি অনুকারক ; আর, অনুকরণে অনুকৃতের বিকৃতি ঘটে। সুতরাং কবির হস্তে সত্যের প্রাণান্ত হয়। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। সুন্দরকে পাইতে হইলেই সত্যকে বলি দিতে হইবে, এমন কোনো যুক্তি নাই। অধিকন্তু, কবি যে সূক্ষ্ম অনুভূতি

লইয়া সুন্দরকে আবিষ্কার করেন, তাহার সাহায্যে সত্যকেও পাওয়া যাইতে পারে। প্লেতোর সমালোচকেরা দেখাইয়াছেন যে, প্লেতোর আবিষ্কৃত যে মহৎ সত্য, কবির অনুভূত সৌন্দর্যের সঙ্গে তাহার তুলনা চলে। উভয়ই অন্তর্দৃষ্টির ফল। সুতরাং গভীরভাবে দেখিতে গেলে কবির সৌন্দর্য-অনুভূতি আর দার্শনিকের সত্য-উপলব্ধি—মনন-শক্তি হিসাবে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাম্য রহিয়াছে। আর প্রকৃত দার্শনিকের নিকট এই বিশাল বিশ্ব একটি বিরাট মহাকাব্য ; ইহা অসুন্দর নয়, অথচ অসত্যও নয়। সুতরাং কবি ও দার্শনিকের মধ্যে একদিকে যেমন প্রভেদ রহিয়াছে, তেমনই অপর দিকে একটা সাম্যও রহিয়াছে যাহা উপেক্ষা করা চলে না।

দর্শন ও জীবন

প্রথম জ্ঞানের অন্বেষণ মানুষ করিয়াছে নিজের জীবনের প্রয়োজনে। মেঘেরা কোথা হইতে আসে, কোথায় চলিয়া যায়, নদীর উৎস কোথায়, দিন-রাত কেমন করিয়া হয়— এই সব এবং আরও এমন সব বিষয় মানুষ জানিতে চাহিয়াছে নিজের জীবনের প্রয়োজনে। মাটি খুঁড়িলে জল পাওয়া যায় জানা থাকিলে জলের প্রয়োজন মিটানো যায়। এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন তথ্যের তল্লাশ মানুষ করিয়াছে।

তারপর খেলিতে খেলিতে যেমন খেলার নেশা জমিয়া যায়— জয়-পরাজয়ের কথাটা তখন আর বড়ো থাকে না—তেমনই জ্ঞানের তল্লাশ করিতে করিতে জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান খোঁজা মানুষের একটা নেশা হইয়া গিয়াছে। আধুনিক উচ্চস্তরের বিজ্ঞানে সেই নেশার খেলা আমরা দেখিতে পাই। দূর আকাশের কোণ হইতে কোন্ নক্ষত্রকে পৃথিবীতে আনিয়া মাপিলে তাহার ওজন কত হইবে না জানিলেও কেনা-বেচার কোনো অসুবিধা মানুষের হয় না। তথাপি ওই সব জানিবার জন্য কী ব্যাকুল চেষ্টাই না মানুষ করিতেছে।

অবশ্যই এইভাবে জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া এমন সব তত্ত্বও মানুষ আবিষ্কার করিয়া ফেলে যাহা কোনো না কোনো সময়ে প্রয়োজনে লাগিয়া যায়;—যেমন রেডিয়মের আবিষ্কার। কিন্তু তাহা হইলেও এই অনুসন্ধিৎসার মূলে প্রয়োজনের কথাটাই বড়ো হইয়া থাকে না।

দর্শনের আলোচনায়ও এই রীতির ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। গোড়ায়—যেমন গ্রীসে সোক্রেতিসের আমলে—জীবনের প্রয়োজনেই দর্শনের সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল। ধর্ম-অধর্ম, নীতি-অনীতি প্রভৃতির বিচার দরকার হইয়া পড়িয়াছিল জীবনটা সুষ্ঠু পরিচালিত করিবার জন্যই। তারপর জীবনে যে দুঃখ আসিবেই তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়ও মানুষ খুঁজিয়াছে। ইহা প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজনেও দার্শনিক বিচার-গবেষণা হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনে এই দুঃখ-লোপের প্রয়োজনটা অত্যন্ত বেশি অনুভূত হইয়াছিল; এবং সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্তি, অথবা 'মোক্ষ', পরমপুরুষার্থ বিবেচিত হইয়াছিল।

এইভাবে প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায়স্বরূপ অনুসৃত হইয়াও দর্শন অনেক সময় এমন তত্ত্বের অবতারণা করে যাহা সাধারণের নিকট অনাবশ্যক মনে হয় এবং এমন সব ভাষা ব্যবহার করে যাহা অনেকের কাছে শুধু অর্থহীন কথার গাঁথুনি বলিয়াই মনে হয়। এই কারণে বহুবার এবং একাধিক স্থলে দার্শনিকেরা লোকের উপহাসের পাত্র হইয়াছেন। দার্শনিকদের বুদ্ধি মেঘাচ্ছন্ন এই কথাটা বুঝাইবার জন্য সোক্রেতিসকে উপলক্ষ্য করিয়া গ্রীসের একজন নাট্যকার একখানা জনপ্রিয় নাটকও লিখিয়াছিলেন। আকাশের নক্ষত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া পায়ের তলের মাটি না দেখিয়া পথ চলিতে চলিতে যে ব্যক্তি কুয়ায় পড়িয়া গিয়াছিল তাহাকে উপদেশ দিয়া বলা হইয়াছিল, পায়ের নিচে মাটি যে দেখে না তাহার কুয়ায়ই পড়া উচিত। এইভাবে নিকটের জিনিস না দেখিয়া, বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যাপারে মন না দিয়া, দূরের জিনিসের

অনাবশ্যক বিষয়ের চিন্তায় ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া দার্শনিকেরা এখনও উপহসিত হইয়া থাকেন।

কিন্তু কোথাও কখনও—মঠে কিংবা আশ্রমে অন্তেবাসীদের নিকট উপদেশ-স্বরূপ প্রদত্ত—দর্শন গূঢ়ার্থ রহস্যবিদ্যায় পর্যবসিত হইয়া থাকিলেও মোটের উপর উহা কখনও জীবনের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কশূন্য হয় নাই। সোক্রেতিস যখন এথেন্সের রাস্তায়, বাজারের পথে, গৃহের অলিন্দে, বন্ধুর বাড়ির নিমন্ত্রণ-উৎসবে বসিয়া যুবকবৃদ্ধ সকলের সঙ্গে সমান ভাবে স্বাস্থ্য কী, সংযম কী, ন্যায় কোন্ পথে—ইত্যাদি প্রশ্ন সকলের বোধগম্য ভাষায় আলোচনা করিতেন, তখন দর্শন যেমন জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল, এখনও তাহাই রহিয়াছে। জীবনের দুঃখ হইতে মুক্তিকে বড়ো প্রশ্ন করিয়া তুলিয়া ভারতীয় দর্শন এক বিশিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে; উহা মোক্ষশাস্ত্র হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেখানেও জীবনই— বর্তমান ঐহিক জীবনের চেয়ে একটা মহত্তর জীবন— সকল গবেষণার কেন্দ্র।

আর যাঁহারা ঐহিক জীবনকে একেবারে মূল্যহীন মনে করেন না, তাঁহারা ইহজীবনের প্রশ্নকেই দর্শনের বিচার্য করিয়া লন। জীবনে আমাদের অনেক সমস্যা আছে। আদর্শের কথা, ন্যায়-অন্যায়ের কথা, কর্ম-অকর্মের কথাও আমাদিগকে সত্য-অসত্যের প্রশ্নের মতো ভাবিতে হয়। সকল বস্তুর মূল্য এক নয়— মানুষের সকল ক্রিয়ার মূল্য এক নয়। পুণ্যাপুণ্যের প্রভেদ আছে। সুখ-দুঃখের ন্যায় এ সব কথাও ভাবিতে হয়। তারপর রাষ্ট্র ও সমাজ এবং সেখানে ব্যক্তি ও শ্রেণীর স্থান—ইত্যাদি অনেক রকম প্রশ্ন তো আজ মানুষের জীবনে দেখা দিয়াছে। এ সকল দর্শনেরই প্রশ্ন। দর্শন শুধু সত্যের অনুসন্ধান করে না, লব্ধ সত্যের মূল্যও নির্ধারণ করে; আর, দর্শন শুধু জগৎকে জানিতে চায় না, জ্ঞান দ্বারা আলোকিত করিয়া জীবনকেও পরিচালিত করিতে চায়। সুতরাং ঐহিক হউক, পারলৌকিক হউক, জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য দর্শন কখনই নয়।

বিজ্ঞান নয় অথচ বিজ্ঞানের মতো সত্যের সন্ধানী, ধর্মে অন্ধবিশ্বাসী নয় অথচ ধর্মের সহায় এবং পরিপূরক, কাব্য নয় অথচ কাব্যের ন্যায় সৌন্দর্যের স্রষ্টা এবং উপভোক্তা, জীবনের উর্ধ্বে অথচ জীবনের পরিচালক—এই যে মানুষের মানস সৃষ্টি, ইহারই নাম দর্শন। প্রথম সাক্ষাতেই ইহাকে চিনিয়া ফেলা কঠিন;—ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে ক্রমশ ইহার রূপ স্পষ্ট হয়।

শ্রেণীভেদ—আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন

কাব্যামোদী মাত্রেই জানেন যে কাব্যের শ্রেণীভেদ আছে। শুধু গদ্যকাব্য ও পদ্যকাব্য নয়; আরও নানারকমে কাব্য এবং কবিদিগকে বিভক্ত করা হইয়াছে। কবি যেমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া জগৎটাকে দেখেন এবং এই ভঙ্গির বৈষম্য অনুসারে বিভিন্ন রকমের কাব্যের সৃষ্টি করেন, তেমনই দৃষ্টি-ভঙ্গির পার্থক্যের জন্য এবং সিদ্ধান্তের প্রভেদের জন্যও দার্শনিকদের দর্শনও বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের প্রভেদটা অত্যন্ত প্রবল ছিল। যে দর্শন বেদ মানিত—বেদের অপৌরুষেয়ত্ব এবং প্রামাণ্য স্বীকার করিত—এবং বেদের শিক্ষা অনুসারে আত্মা ও পরলোক মানিত—সে দর্শনকে আস্তিক দর্শন বলা হইত। আর যে দর্শন তাহা মানিত না, তাহা ছিল নাস্তিক। নাস্তিক দর্শনের মধ্যে বৌদ্ধ ও চার্বাক দর্শনই সমধিক প্রসিদ্ধ। চার্বাক যে শুধু বেদ অমান্য করিতেন, তাহা নয়; উহাকে যে শুধু অবহেলা করিয়াছেন, তাহা নয়; তীব্রভাবে উহাকে আক্রমণও করিয়াছেন। তাঁহার মতে, তিন শ্রেণীর লোক—ভণ্ড, ধূর্ত এবং নিশাচর (অর্থাৎ মাংসাশী রাক্ষস) মিলিয়া বেদ সৃষ্টি করিয়াছে।[১] কিন্তু এইপ্রকার তীব্র আক্রমণ সত্ত্বেও বেদে বিশ্বাসী বহু ছিল; এবং অধিকাংশ

১ "ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ড-ধূর্ত-নিশাচরাঃ।"

হিন্দু দর্শনই বেদ মানিয়া লইয়াছে। সকলের আস্থা সমান না হইলেও 'ষড়-দর্শন' বলিতে সাধারণত যে ছয়টি দর্শন বুঝায় তাহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিত। মীমাংসা দুইটি—জৈমিনির পূর্ব-মীমাংসা এবং বাদরায়ণের উত্তর-মীমাংসা—বিশেষ করিয়া বেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

আস্তিক ও নাস্তিকের প্রভেদ ইউরোপীয় দর্শনেও রহিয়াছে। কিন্তু সেখানে এই প্রভেদ বেদে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বারা নির্ণীত হয় না। সেখানে উহা পরলোক এবং বিশেষ করিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। ঈশ্বর অস্বীকার করিয়াও জীব-জগৎ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত হইতে পারে; তাহাই হইবে নাস্তিক দর্শন। আর, ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া যে দর্শন হয়, তাহা আস্তিক। এখনও আস্তিক্য-বুদ্ধি দর্শনে প্রধান হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু আস্তিক হইতেই হইবে, এরূপ কোনো শপথ দর্শন করে না। প্রমাণে অসিদ্ধ হইলে ঈশ্বর অস্বীকার করিতে দর্শন ভয় পায় না। আর প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে নাস্তিক দর্শনের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়।

আস্তিক ও নাস্তিক ছাড়া আরও দর্শনের যে সব বিভিন্ন শ্রেণী আছে, সে সকলের কথা এখানে উত্থাপন করা সম্ভব নয়, আর আমাদের পক্ষে প্রয়োজনও নয়।

মূল প্রশ্ন

সাধারণভাবে দর্শনের রূপ বুঝিতে হইলে তাহার মূল জিজ্ঞাসা কী, তাহাই জানিতে হয়। চিন্তাশীল মানুষের মনে অনেক প্রশ্নই জাগে, অনেক জিজ্ঞাসাই উদিত হয়। কিন্তু সব প্রশ্নই দর্শনের এলাকায় পড়ে না। এমন একটা সময় অবশ্যই ছিল, যখন মানুষের জ্ঞান এখনকার মতো এমন সহস্রধারায় সহস্র দিকে প্রবাহিত হইত না। এখন যেমন জ্ঞান-রাজ্যে অনেক বিভাগ ও

উপবিভাগ সৃষ্ট হইয়াছে,—শরীর-তত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান ইত্যাদি—তেমনটি ঠিক জ্ঞানের শৈশবেও ছিল না। তখন সমগ্রভাবে মানুষের জ্ঞান গড়িয়া উঠিতেছিল এবং যাহা কিছু মানুষ জানিতে পারিয়াছিল, সমস্তই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং দার্শনিকের হেপাজতেই থাকিত। কিন্তু জ্ঞান-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বিশেষজ্ঞদের আবির্ভাব হইতে লাগিল; এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ও দর্শন ইত্যাদির পৃথক্ পৃথক্ স্থান ও অধিকার নির্দিষ্ট হইতে লাগিল। বর্তমানে অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বিশ্বের বিভিন্ন অংশ যেমন বিভিন্ন বিজ্ঞান আলোচনা করে, তেমনই বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যেও একটা সীমা নির্দেশ হইয়া গিয়াছে। অবশ্যই, দর্শন সমগ্র বিশ্বের উপর একটা সাধারণ অধিকার এখনও ত্যাগ করে নাই এবং বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ পুনর্বিচারের অধিকারও দাবি করে। তথাপি বিস্তৃত এবং সূক্ষ্ম বিচারের জন্য কতকগুলি প্রশ্ন সে অন্যান্য বিদ্যার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহার ফলে কতকগুলি সমস্যা বিশেষভাবে দার্শনিক সমস্যা হইয়া গিয়াছে, আর কতকগুলি শুধু সাধারণ ভাবে এবং পুনবিচারের জন্য দর্শনের অধীন রহিয়াছে।

আকাশ কেন নীল, গাছের পাতা কেন সবুজ, ধ্রুবতারা হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে কত সময় লাগে, সূর্য পৃথিবীর চেয়ে কত গুণ বড়ো, হরিণের কেন শিং হয়—আর ময়ূরীর কেন পেখম নাই, জীব ও উদ্ভিদে পার্থক্য কী, জন্তুরা খায় এবং ঘুমোয় কেন—ইত্যাদি সহস্র সহস্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসুর মনে উদিত হয়। কিন্তু আরিস্ততলের (Aristotle) সময় যাহাই হউক না কেন, বর্তমানে ইহারা দার্শনিক বিচারের আওতায় পড়ে না। বিজ্ঞান এ সকলের আলোচনা করিবে। বিজ্ঞান এ সব ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত করিবে তাহার পুনর্বিচারের অধিকার দর্শনের থাকিলেও এ সকল দর্শনের নিতান্ত নিজস্ব প্রশ্ন নয়। তাহা হইলে দর্শনের মূল প্রশ্ন কী।

মানুষ জীব, এবং জগতে সে বাস করে। দর্শনের প্রধান প্রশ্ন এই জীব ও জগৎ সম্বন্ধে। দর্শন নিতান্তই পারলৌকিক ব্যাপার—ইহজীবন এবং ইহলোক সম্বন্ধে তাহার কোনো আগ্রহ নাই; এ কথা কখনও কোনো ক্ষেত্রে সত্য হইলেও, সাধারণভাবে—বিশেষত আধুনিক দর্শনের বেলায়, অসত্য। জীবের স্বরূপ, তাহার আবির্ভাব ও স্থিতি এবং ভবিষ্যৎ, দর্শন চিন্তা করে; আর জগৎ সম্বন্ধেও কতকগুলি প্রশ্ন আছে যাহা দর্শনের নিজস্ব। তাহা ছাড়া, জীব ও জগতের সম্বন্ধ হইতে এবং প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস হইতে মানুষ আর একটি সত্তার কথা জানে যাহার কথাও দর্শনকে ভাবিতে হয়; সেটি ঈশ্বর। সংক্ষেপে এবং মোটামুটি ভাবে দর্শনের মূল বিচার্য বিষয় এই তিনটি—(১) জগৎ, (২) জীব, ও (৩) ভগবান্।

ইহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি প্রশ্ন উঠিতে পারে এবং উঠিয়াছে; সেগুলি সবই দর্শনের বিষয় নয়। জীবজগতের অন্তর্ভুক্ত এক মানুষকেই কত রকমে জানিবার চেষ্টা হইয়াছে। মানুষের দেহ—দেহের গঠন ও কাজ, মানুষের মন, তাহার সমাজ, তাহার ইতিহাস, তাহার ধর্ম ও আচার ইত্যাদি কত প্রশ্নই না মানুষ নিজের সম্বন্ধে করিয়াছে। এই এক-একটি দিক ধরিয়া মানুষের সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানও আবির্ভূত হইয়াছে—দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি। এই সব প্রশ্নের ব্যস্তভাবে বিচার করে বিভিন্ন বিজ্ঞান। কিন্তু সমগ্র মানুষের সমস্তভাবে বিচার দর্শনের কাজ।

জগৎ সম্বন্ধেও তাহাই। জগতের বিভিন্ন প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া থাকে। আকাশের জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের জন্য আলাদা বিজ্ঞান আর পৃথিবীর জন্য কিংবা প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য বিজ্ঞানও পৃথক্। এ সব বিষয়ে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সাধারণভাবে দর্শন গ্রহণ করিতেই চেষ্টা করে; অবশ্যই বিনা পরীক্ষায় নয়। কিন্তু জগতের উৎপত্তি ও স্বরূপ,

বিশেষত তাহার সত্যতা প্রভৃতি গভীরতর মূলগত প্রশ্ন দর্শনের নিজস্ব জিনিস।

ঈশ্বরের কথা বিশেষ করিয়া ভাবে এবং বলে ধর্ম। অবশ্যই, ধর্ম ঈশ্বরের কথা যতটা বলে, ততটা ভাবে কি না সন্দেহ। ধর্ম একটা অপৌরুষেয় শাস্ত্রের উপর—একটা আপ্তবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে শাস্ত্রকে বুঝিবার এবং বুঝাইবার চেষ্টা ধর্ম অবশ্যই করে, কিন্তু তাহার একটা সীমা আছে; পূর্ণ স্বাধীন চিন্তার অবসর সেখানে খুব বেশি নয়। সুতরাং সত্য সত্য ঈশ্বরের সম্বন্ধে যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে বিচার ঠিক ধর্ম করে না; উহা দর্শনেরই কাজ।

এইভাবে জীব, জগৎ এবং ঈশ্বরের কথা ছাড়া আরও একটা বড়ো কথা দর্শন চিন্তা করে, যাহা আর কেহ করে না। জ্ঞানের সীমা এবং পরিধি—এবং প্রকৃতপক্ষে চরম সত্য মানুষ আদৌ জানিতে পারে কি না, ইহাও একটা প্রশ্ন। সাধারণ মানুষ মনে করে, আমরা সবল সতেজ ইন্দ্রিয়ের অধিকারী—দেখি, শুনি, স্পর্শ করি; আর সবল বুদ্ধির সাহায্যে এই ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের বিচার করি; সুতরাং জগৎটা আমরা জানি বইকি। আর, ক্রমশ যন্ত্রপাতির সাহায্য যত বাড়িবে—দূর-বীক্ষণ, অণু-বীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রের শক্তি যত বেশি হইবে ততই দূর হইতে দূরের এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম বস্তু আমরা জানিতে পারিব। ইহা সাধারণ মানুষ এবং বৈজ্ঞানিক উভয়েই বিশ্বাস করে। কিন্তু এই যে বহু-জন-সম্মত সংগীত, ইহার মধ্যে দার্শনিক একটু বেসুরা গাহিয়া থাকেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, সত্য সত্যই কি বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ আমরা জানিতে পারি। চোখের দেখায়, কানের শোনায় ভুল হয়; এককে আর বলিয়া জানিয়া বসি। তাহা ছাড়া, একই জিনিস দুই জনে এক রকম অনেক সময়ই দেখে না। বিচার-সিদ্ধান্তের মধ্যেও মতভেদ রহিয়াছে প্রচুর; দর্শন নিজেই তাহার প্রমাণ। সুতরাং আমাদের বস্তুর জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে কতটুকু অভ্রান্ত, তাহাও

ভাবিতে হয়। জ্ঞানের জ্ঞানও আমাদের থাকা দরকার। কী ভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার ভিত্তি কী, তাহাতে আসল কতটুকু আর মেকি কত, তাহার দৌড় কত দূর,—এ সকলও বিচারের বিষয়। এই বিচার দর্শন করে।

দর্শন জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়কেই জানিতে চায়। জ্ঞেয় বলিতে দর্শন বুঝে—জীব, জগৎ ও ঈশ্বর ; তাহার অর্থ, সমগ্র বিশ্ব এবং তাহার স্রষ্টা। অর্থাৎ স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে যেখানে যাহা কিছু আছে, দর্শনের জ্ঞেয় সে সব কিছুই। অবশ্যই ইহার কোনোটাকেই দর্শন খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে না—সে কাজ অন্যের, বিভিন্ন বিজ্ঞানের। দর্শন এই সমস্তকেই দেখে সমগ্রভাবে এবং পরস্পরের সহিত সম্বন্ধভাবে। এই সমস্ত জিনিস জানার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান কী, তাহাও দর্শন জানিতে চায়।

সকলের বিচার ও সিদ্ধান্ত এক হয় না বলিয়া দর্শন ও দার্শনিকের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী রহিয়াছে। কিন্তু বিচারের ফল যাহাই হউক না কেন, বিচার্য বিষয় সর্বত্রই ওই এক। আর, পরস্পরের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রভেদ সত্ত্বেও সাধারণভাবে বিচারের পদ্ধতিটাও এক। অতঃপর এই সব জ্ঞেয় বস্তু সম্বন্ধে দর্শন কী বলে, তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে।

দার্শনিকের জগৎ

প্রথমেই স্মরণ করিয়া লওয়া ভালো যে, দর্শন একটা গুহ্য বিদ্যা নয়, রহস্যজালে তাহাকে আবৃত করিয়া রাখা হয় না, এবং গোপনে মন্ত্রসিদ্ধি দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করিতে হয় না। যাহার বুদ্ধি সেই ধাপে উঠিয়াছে তাহার কাছেই প্রকাশ্যে উহার আলোচনা চলিতে পারে। বিদ্যালয়ে দান করা হয় যে সব বিদ্যা, তাহা আয়ত্ত করিবার মতো শক্তি অর্জিত হইলেই যেমন বিদ্যার্থী উহা লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য কোনো গোপন সাধন-ভজনের কাহারও প্রয়োজন হয় না,—তেমনই দর্শনও অধ্যেতব্য বিদ্যা এবং মানসিক যোগ্যতার উপরই উহার বিতরণ নির্ভর করে, আর কিছুর উপর নয়। এই হিসাবে অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে দর্শনের পূর্ণ সহযোগিতা রহিয়াছে। দর্শন বিজ্ঞানের সমালোচক— কিন্তু বিজ্ঞানকে সে বর্জন করে না এবং বৈজ্ঞানিকের পরিশ্রম ও সাধনাকে সে নিতান্তই বাজে বলিয়া উপেক্ষা করে না। বরং বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে দর্শনের যে ধারণা তাহা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

নিয়মের রাজত্ব

বিজ্ঞান জগৎ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছে এবং যাহা দর্শন পুরাপুরি মানিয়া লইয়াছে তাহার মধ্যে জগৎটা যে নিয়মের অধীন এই কথাটাই প্রধান। নিয়মের মধ্যে আবার কার্য-কারণের সম্বন্ধের যে নিয়ম, উহা অন্যতম। জাগতিক নিয়ম সর্বকালে এবং সর্বস্থানে সত্য। এমন কখনও হয় না যে, যে নিয়ম ভারতে সত্য, তাহা আমেরিকাতে সত্য নয়, কিংবা যাহা পৃথিবীতে সত্য তাহা মঙ্গলগ্রহে সত্য নয়। উপর দিকে ঢিল ছুড়িলে উহা নিচে

নামিয়া আসে; শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র; এবং শুধু পৃথিবীতে নয়, মঙ্গলগ্রহে কেহ ঢিল ছুড়িলে সেখানেও উহা মাটিতেই পড়িবে। আর শুধু আজ নয়—চিরকালই এই নিয়ম সত্য; মহাভারতের যুগেও সত্য ছিল, এখনও আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। তেমনই আলোক বিকিরণের যে রীতি—একটা আলোককেন্দ্র হইতে যে নিয়মে চারিদিকে আলো ছড়াইয়া পড়ে—তাহাও সর্বত্র এক; প্রদীপের আলো, সূর্যের আলো, ধ্রুবতারার আলো—সবই একই নিয়মের অধীন। কার্য-কারণ সম্পর্কেও এই একই কথা। কোনো কারণ হইতে যে কার্যের উৎপত্তি হয়—দাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে আগুন যে উহা পুড়াইয়া দেয়—এ নিয়মও সার্বত্রিক এবং সনাতন; কখনও পুড়ে, কখনও পুড়ে না, এমন নয়।

আকস্মিকতার অভাব

নিয়মের অধীন বলিয়াই জগতে আকস্মিক কিছু ঘটে না। হঠাৎ একদিন সূর্য আলো দিতে ভুলিয়া গেল কিংবা চলিতে চলিতে মধ্যপথে পৃথিবীর গতি রুদ্ধ হইয়া গেল কিংবা হঠাৎ একদিন নদীরা পাহাড়ের দিকে উজান বহিতে লাগিল, এমন কিছু বৈজ্ঞানিক কল্পনা করিতে পারেন না, দার্শনিকও না। অবশ্যই আলো দিতে দিতে সূর্য একদিন নিবিয়া যাইতে পারে, ইহা বিজ্ঞানের কল্পনার বাহিরে নয়। কিন্তু তাহা যদি ঘটে, হঠাৎ ঘটিবে না, কোটি কোটি বৎসর পরে ঘটিবে এবং আদৌ নাও ঘটিতে পারে। যদিই উহা কখনও ঘটে, তবে সে পরিণতি ধাপে ধাপে আসিবে, আকস্মিকভাবে নয়, কোনো নিয়ম অমান্য করিয়াও নয়।

জগৎ-যন্ত্র

জগতের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সহিত নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ রহিয়াছে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন প্রত্যেকের সহিত সম্বদ্ধ— এবং সকলের সমবেত ক্রিয়ার উপরই যেমন দেহের জীবন নির্ভর করে, তেমনই জগতেরও বিভিন্ন অংশের মধ্যে এবং অংশ সকল ও অংশীর মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সমবায়-সম্বন্ধ রহিয়াছে। ধ্রুবতারা হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর এক কণা ধূলি— আর দূর অতীতের একটি ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানের কোনো ঘটনা পর্যন্ত— কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া চীন-জাপানের যুদ্ধ পর্যন্ত— এই বিশাল জগতের সব কিছুই সব কিছুর সহিত সম্পৃক্ত আছে। আমাদের জ্ঞানের সীমা আছে; আমরা সব জায়গায় এই সম্বন্ধ জানিতে পারি না। কিন্তু সম্পর্ক যে রহিয়াছে, তাহা বিশ্বাস করিবার মতো প্রমাণ আমরা প্রচুর পাইয়াছি। নানা দিক হইতে এই প্রমাণ বিজ্ঞান পাইয়াছে যে, আকাশে ছড়ানো অসংখ্য নক্ষত্ররাজি, সৌরমণ্ডল, পৃথিবীর সব জীবজন্তু ও নদী-পাহাড়— এই সমস্ত মিলিয়া যে বিশাল বিশ্ব, তাহা একটি বিরাট যন্ত্রের মতো। একটি ছোটো ঘড়ি কিংবা একটা বড়ো এঞ্জিন যেমন একটা যন্ত্র এবং ইহাদের বিভিন্ন অংশ যথাযথভাবে কাজ করিলেই যেমন যন্ত্র চলে, জগৎটাও ঠিক তেমনই। জগতে যাহা কিছু ঘটে, সমস্ত যন্ত্রের সক্রিয়তা হইতেই তাহা ঘটে। বাগানের কোণে যদি একটি ছোটো ফুল ফুটিয়া থাকে, তবে জগতের সমস্ত শক্তি সহায়তা করিয়াছে বলিয়াই উহা ফুটিয়াছে; আর ওইখানেই ওই সময়ে ওই আকারে যে উহার আবির্ভাব হইয়াছে, সেটাও সমস্ত জগতের সমগ্র ক্রিয়ার ফল।

জগতের অতীত ও ভবিষ্যৎ

জগতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটা নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে; শুধু যে দূরের বস্তুর সহিত নিকটের বস্তুর সম্বন্ধ আছে তা নয়, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এবং বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতেরও একটা সম্পর্ক রহিয়াছে। জগতের বর্তমান হইতে উহার অতীত কী ছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি এবং ভবিষ্যতে কী ঘটিবে, তাহাও আন্দাজ করিতে পারি। মনে রাখিতে হইবে, মানুষ সর্বজ্ঞ নয়; তাহার জ্ঞান নানা দিকেই সীমাবদ্ধ। তথাপি, উত্তুঙ্গ পর্বত এবং গভীর সমুদ্র বুকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে যে আমাদের এই পৃথিবী, সে যে এক সময় অত্যন্ত উত্তপ্ত একরাশি বাষ্পমাত্র ছিল, তাহা অনুমান করিবার মতো যুক্তি বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে। আর, লক্ষ কোটি বৎসর পরে এই পৃথিবীতে মানুষের স্থান টাইফয়েড্, ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মার বীজাণুরা কাড়িয়া লইবে কি না, এ সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করিতে না পারিলেও কাল যে সূর্য উঠিবে এবং চন্দ্রগ্রহণ কবে হইবে এবং নদীর জোয়ার কখন আসিবে, এরূপ ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান জানে। বিজ্ঞানের এই অনুমানে কোথাও ভুল হয় না, এমন কথা বৈজ্ঞানিক বলিবেন না; আর, ভবিষ্যৎ বলার এই শক্তির অপব্যবহারও যে যথেষ্ট হয় তাহাও সকলেই জানে। বিপন্ন ব্যক্তিরা নিজের ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য— মকদ্দমা জিতিবে কি না লটারিতে টাকা পাইবে কি না, ইত্যাদি জানিবার জন্য অনেক সময় পর-প্রতারকের সাহায্যে আত্ম-প্রতারণা করিয়া থাকে, ইহাও ঠিক। তথাপি জগতের সমস্ত ভবিষ্যৎ এবং সমস্ত অতীতই বিজ্ঞানের নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। জগতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, তাহা হইতেই আমরা অতীত ও ভবিষ্যৎ জানিতে পারি; আবার আমাদের ভবিষ্যতের অনুমান যে সত্য হয়, তাহা হইতেও এই সম্পর্ক প্রমাণিত হয়।

ভারতীয় চিন্তায় জগৎ-যন্ত্র

প্রাচীন ভারতে জগৎ সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহার মধ্যে উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়, এই তিনটা স্তর বা অবস্থাভেদ সাধারণত স্বীকৃত হইত। সেইজন্য তিন জন দেবতাও কল্পিত হইয়াছিলেন। উৎপত্তির দেবতা ব্রহ্মা, ইনি সৃষ্টি করেন; আর বিষ্ণু সেই সৃষ্টি রক্ষা করেন বলিয়া তিনি স্থিতির দেবতা; সর্বশেষে, যথাসময়ে এই সৃষ্টির প্রলয় হয়, এবং উহা ধ্বংস করেন রুদ্র বা শিব। দেবতাদের কথা বাদ দিয়াও জগতের তিনটা স্তর স্বীকার করা চলে। সাধারণ অভিজ্ঞতায় উহার পক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়। যে কোনো একটি জাগতিক বস্তু— যেমন একটি বৃক্ষ— যদি আমরা নিবিষ্ট-ভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তবে তাহার জীবনে এই তিনটি অবস্থা দেখা যাইবে। বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি সর্বদাদৃষ্ট ঘটনা। তারপর সেই বৃক্ষ ক্রমশ বড়ো হয়, ফুল ও ফল ধরে— কিছুকাল এইভাবে পৃথিবীর বুকে জীবন যাপন করে; সেটা তাহার স্থিতি। অবশেষে, পাতা ঝরিয়া পড়ে, ডাল ভাঙিয়া যায়— বৃক্ষের জীবনে জরা আসে, এবং একদিন সে আর থাকে না, মৃত্যু আসে, প্রলয় হয়। মানুষের জীবনেও তাই। এমন কি, জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির বেলায়ও এই তিনটা স্তর লক্ষ্য করা যায়। জাতির উত্থান ও পতন তো ইতিহাসের পুরানো কথা। মিশর, বাবিলন, গ্রীস, রোম আসিয়া গিয়াছে, তাহাদের জীবনেও আবির্ভাব, স্থিতি এবং বিলয়— এই তিনটি স্তর দেখা যায়। এই সব দেখিয়া ভারতীয় মন সারা বিশ্বের ইহাই সাধারণ নিয়ম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। বিশ্ব আমাদের সম্মুখে বিরাজ করিতেছে, সুতরাং তাহার স্থিতি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। আর, জগতের ছোটো বড়ো সব জিনিসেরই একটা আরম্ভ দেখা যায়, সুতরাং সমগ্র বিশ্বও একদিন আরব্ধ

হইয়া থাকিবে; এবং সেই নিয়মেই তাহার আবার বিলোপও হইবে; ইহারই নাম প্রলয়।

তারপর? তারপর আবার সেই জগৎ ফিরিয়া আসিবে। একজন মানুষের তিরোভাব হইলে আবার যেমন আর একজনের আবির্ভাব হয়, তেমনই এই দৃশ্যমান জগতের তিরোভাবের পর— অর্থাৎ প্রলয়ের পর আবার জগৎ আসিবে; কিন্তু নূতন জগৎ নয়— এই পুরাতন জগৎই প্রথম হইতে আবার দেখা দিবে। ঠিক যেমন ছবির ফিল্‌ম; এক দিকে ছবি দেখাইতে দেখাইতে অন্য দিকে গুটাইয়া যায়; এবং আবার প্রথম হইতেই সেই ছবিই দেখানো চলে; গোটা জগৎটাও ঠিক তাই। একই জগৎ-নাট্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইয়া যাইতেছে।

বিশ্বের জীবনে ভারতীয় কল্পনায় চারিটি যুগ কল্পিত হইয়াছিল— সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। কোন্ যুগে জগতের অবস্থা— বিশেষত মানুষের সমাজের অবস্থা— কিরূপ হইবে, তাহাও চিন্তা করা হইয়াছিল; এবং প্রত্যেক যুগের স্থিতিকালও মাপিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল। চারি যুগের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলেই প্রলয় এবং প্রলয়ান্তে আবার প্রথম হইতে— সত্যযুগ হইতে— পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। চক্রের মতো সৃষ্টি এইভাবে ঘুরিয়াই চলিয়াছে।

জগতের নানা স্থান অধিকার করিয়া বিভিন্ন দেবতারা রহিয়াছেন— কোথাও ইন্দ্র, কোথাও বরুণ, কোথাও আদিত্য। রাজার রাজ্যে রাজকর্মচারীর মতো ইঁহারা স্ব স্ব কর্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন— সৃষ্টি রক্ষা ও পালন করিতেছেন। প্রলয়কালে জগতের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারাও নিরুদ্দিষ্ট হইবেন এবং সৃষ্টির পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারাও আবার দেখা দিবেন।

আর এই যে যুগ-যুগান্তরব্যাপী জগতপ্রবাহ ইহা অনাদি এবং অনন্ত। যে জগৎ আমরা দেখিতেছি— চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ইত্যাদি— ইহার আরম্ভ এক সময় হইয়াছিল এবং যথাসময় ইহার বিলোপও হইবে। কিন্তু তারপর

এই জগতই প্রথম হইতে আবার দেখা দিবে এবং স্থিতিকাল শেষ হইলে অর্থাৎ চারি যুগ সমাপ্ত হইলে, আবার উহারও বিলয় হইবে। এই যে জগতের আসা-যাওয়া, ইহা একটা অনাদি ও অনন্ত প্রবাহ। অনেকটা সিনেমা-গৃহের ছবি দেখানোর মতো। পর পর তিনবার ছবি দেখানো শেষ হইলে, সেদিনকার মতো বন্ধ। আবার, পরদিন সেই ছবি আবারও পর পর তিনবার দেখানো হইবে। তফাত এই যে, সিনেমা-গৃহের ছবি তিন দিন বা সাত দিন পর বদলাইয়া যায় : জগৎ-প্রবাহে তাহা হয় না ; ঘুরিয়া ঘুরিয়া একই নাট্য বার বার অভিনীত হইয়া আসিতেছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া একই যুগ-চতুষ্টয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে।

জগতের ক্রমোন্নতি

এই যে কল্পনা, ইহা কবিকল্পনা কিংবা শিশু-সাহিত্যের কল্পনা নয় ; ভারতীয় দর্শনও ইহা মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক দর্শন প্রলয় এবং একই জগৎচক্রের বার বার ঘূর্ণন, এই দুইটি কল্পনা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। চতুর্যুগ, যুগান্তে প্রলয় এবং প্রলয়ান্তে আবার চতুর্যুগব্যাপী সেই একই জগৎ-চক্র— এই কল্পনার ভিতর কোনো ক্রমোন্নতি কিংবা নূতনের আবির্ভাবের অবকাশ নাই। কিন্তু জগতের অতীত এবং বর্তমান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া বিজ্ঞান বাহির করিয়াছে যে, জগতে যদিও আকস্মিক কিছু ঘটে না, তথাপি ক্রমিক বিকাশে নূতনের আবির্ভাব হয়। যাহা ছিল না এমন জিনিস এখানে আসে— বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শুধু অতীতের পুনরাবৃত্তিই নয়। বিজ্ঞান পৃথিবীর যে ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করিয়াছে তাহা সংক্ষেপে এই। পৃথিবী সূর্য হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে। সূর্য লক্ষ লক্ষ ডিগ্রী তাপে উত্তাপিত একটা বিরাট বাষ্পপিণ্ড। পৃথিবীও কাজেই প্রথমটায় একটা প্রচণ্ড উত্তপ্ত বাষ্পপিণ্ড

ভিন্ন আর কিছু ছিল না। তারপর আস্তে আস্তে উহার তাপ কমিয়াছে— ক্রমে উহা জলে স্থলে বায়ুতে বিভক্ত হইয়া প্রাণীবাসের উপযুক্ত হইয়াছে। তারপর প্রথম প্রাণকণার আবির্ভাব হয়; যেখান হইতেই হউক, যেমন করিয়াই হউক— পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব হয়। ক্রমশ এই প্রাণের আবার নানারকম পরিবর্তন হইয়াছে এবং বিভিন্ন আকার এবং প্রকারে সে নিজেকে বিভক্ত করিয়াছে। তাই আজ নানাপ্রকার বৃক্ষলতা, জীবজন্তুতে ধরা পরিপূর্ণ। এই প্রাণবৃক্ষের চূড়ায় আবির্ভূত হইয়াছে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব— মানুষ।

এইভাবে পৃথিবীতে যাহা ঘটিয়াছে, সূর্যে তাহার কিছুই নাই; এ সবই নূতন। আর এখানেই যবনিকাপাত হইয়াছে, এরূপ মনে করিবারও কোনো যুক্তি নাই; আরও নূতন আসিতে পারে— সে সম্ভাবনা রহিয়াছে। জগতের গতি একটা ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতির দিকে। সৃষ্টির শেষ অধ্যায় এখনও আসে নাই; কবে আসিবে, তাহা ভাবিতে কল্পনা ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু দিনের পর দিন জগতে যাহা ঘটিতেছে তাহা যে শুধু অতীতেরই পুনরাবৃত্তি নয়— ক্রমশ নূতনতর জিনিসও যে আসিতেছে, ইহা ঠিক। মানুষের সমাজের দিকে চাহিলে এই ক্রমোন্নতি বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে। ব্যক্তির জীবনে উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় আছে, ঠিক; ছোটো ছোটো গোষ্ঠীর বেলায়, এমন কি, সাম্রাজ্যের ও জাতির বেলায়ও তাহা রহিয়াছে। রোম, গ্রীস ইত্যাদির ইতিহাস তাহার প্রমাণ। কিন্তু রোম, গ্রীসের চেয়েও বড়ো বিরাট মানব-জাতিকে ধরিলে তো ক্রমোন্নতিই দেখা যায়— প্রলয় তো নয়। মানব-জাতির ভিতরে নূতন জাতি, নূতন সাম্রাজ্যের আবির্ভাব-তিরোভাব অনবরতই ঘটিতেছে। কিন্তু মোটের উপর মানবের তো ধ্বংস না হইয়া উন্নতিই হইতেছে। রেডিও, টেলিফোন ইত্যাদির আবিষ্কারই তাহার প্রমাণ।

সুতরাং জগৎ ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে—পুরাতনের স্থলে নূতন আসিতেছে, তারপর আবার নূতনতর। সূর্যে যে মানুষ ছিল না, পৃথিবীতে সে আসিয়াছে। অভিনবের আবির্ভাব ঘটিতেছে। আর এই ক্রমোন্নতির গতিতে হঠাৎ কোথাও কখনও ছেদ আসিয়া পড়িবে, এরূপ মনে করিবার পক্ষেও যুক্তি নাই। সুতরাং উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের মধ্য দিয়া যুগের পর যুগ ধরিয়া জগতে একই নাট্য পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইয়া চলিয়াছে, এরূপ মনে করিবার বিরুদ্ধে যুক্তি আছে।

জাগতিক নিয়ম ও অলৌকিক ঘটনা

জগতে আকস্মিক কিছু ঘটে না সত্য, তথাপি নিয়মের মধ্য দিয়া ক্রমিক বিকাশের ফলে অভিনব-বস্তুর আবির্ভাব হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইতে পারে। কিন্তু জগতের নিয়ম কোথাও কখনও ব্যাহত হইয়া অলৌকিক কিছু ঘটিবার অবকাশ দিতে পারে কি। বিজ্ঞানের বিশ্বাস জগতে কার্য-কারণ নিয়মের কোথাও ছেদ নাই; এমন কিছুও ঘটে না, জগতের পূর্ব ইতিহাসে যাহার কারণ নাই। আমাদের জ্ঞানের সীমা আছে বলিয়া সব সময় কারণ আমাদের চোখে না পড়িতে পারে; কিন্তু বিনা কারণে কিছু ঘটে না। আর জগতের নিয়ম অতিক্রম করিয়াও কিছু ঘটে না। প্রকৃতির নিয়ম কোথাও কিছুক্ষণের জন্য বাতিল হইয়া যায় এবং ঈশ্বরের অনুগৃহীত কোনো ব্যক্তি তাহাতে কতকটা সুবিধা পাইয়া যান, এমন অনেক বিবরণ প্রাচীন সাহিত্যে—বিশেষত ধর্ম-সাহিত্যে মিলে। বিজ্ঞানের পক্ষে সেগুলি স্বীকার করা সম্ভব নয়। ধ্রুব-প্রহ্লাদের উপাখ্যানে কিংবা ঈশা-মুশার জীবনীতে এমন অনেক বৃত্তান্ত আছে যাহা বিজ্ঞানের পক্ষে স্বীকার করা কঠিন। মুশার সুবিধার জন্য হঠাৎ লোহিতসাগরের জলরাশি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল আর মুশা পার হওয়া মাত্রই আবার সাগর হইয়া গেল—

এরূপ সব বৃত্তান্ত ভগবদ্ভক্তির সহায়তা করিলেও বিজ্ঞানের কাছে সত্য নয়। এখনো এরূপ কাহিনী রচিত হয়; কিন্তু বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে সে সবই মেকি হইয়া যায়।

মনে রাখিতে হইবে, অলৌকিক আর অসাধারণ এক নয়। জগতের নিয়ম অস্বীকার করিয়া তাহার বিরুদ্ধে যাহা ঘটে, তাহা অলৌকিক। হঠাৎ যদি দেখি, শহরের পাকা বাড়িগুলি সব আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তবে তাহাকে বলিব অলৌকিক ঘটনা। কিন্তু এমন যদি কেহ থাকেন, যিনি দশ অঙ্কের একটা গুণ স্লেট-পেনসিলের সাহায্য ছাড়া করিতে পারেন, তবে তাঁহার সেই শক্তি অসাধারণ, কিন্তু অলৌকিক নহে। নিউটনের মনীষা ছিল অনন্যসাধারণ; নিউটন বাড়িতে বাড়িতে, এমন কি দেশে দেশেও জন্মেন না। কিন্তু তথাপি তাঁহার শক্তি অলৌকিক নয়। তেমনই কাহারো ভূত-ভবিষ্যৎ জানিবার অসাধারণ শক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু সে শক্তি জগতের নিয়ম অনুসারেই ক্রিয়া করে, সুতরাং অলৌকিক নয়।

অলৌকিক অর্থ নিয়মের ব্যতিক্রম। নিয়মের ব্যতিক্রম বিজ্ঞান স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। এইজন্য বিজ্ঞানকে— এবং সঙ্গে সঙ্গে দর্শনকেও— এক সময় অবিশ্বাসী, নাস্তিক, ঈশ্বর-বিদ্বেষী ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা যুক্তিহীন। বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের প্রয়োজন না থাকিলেও বিজ্ঞান ঈশ্বর মানে না, এমন নয়; আর, বিজ্ঞান যদিই বা কখনো ঈশ্বর অস্বীকার করিয়াছে, তথাপি দর্শনকেও তাহা করিতে হইবে, এমন নয়। বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েই ঈশ্বরকে খামখেয়ালী মনে করিতে প্রস্তুত নয়। জগতের নিয়ম ঈশ্বরেরই নিয়ম। সে নিয়ম তিনি যখন খুশি রদ করিয়া দেন, ইহা ভাবিলে তাঁহার চরিত্রের স্থৈর্য অস্বীকার করা হয়। যিনি নিয়ম করেন, তিনিই যদি সেই নিয়ম যখন তখন ভাঙিয়া ফেলেন, তবে নিয়মের গৌরব থাকে না। সুতরাং জগতের নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা

দেখাইলেই ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানো হয় না। বিজ্ঞান হয়তো অনেক সময় নিয়মকেই বড়ো করিয়া দেখে। কিন্তু দর্শনের কাছে নিয়ম ও নিয়ন্তা উভয়ই সমান সত্য।

জাগতিক নিয়ম ও নৈতিক বিধি

এই পর্যন্ত দার্শনিকের জগৎ আর বৈজ্ঞানিকের জগৎ এক। জগৎ যে নিয়মের অধীন এবং এই নিয়মের যে কোনো প্রতিপ্রসব নাই, আর বিনা কারণে আকস্মিকভাবে যে জগতে কিছু ঘটে না, ইহা দর্শন ও বিজ্ঞানের উভয়েরই স্বীকৃত। কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে আর একটা প্রশ্ন আছে যাহার উত্তর দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। এই জগৎটা কি নৈতিক নিয়মেরও অধীন। পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার কি জগতে জাগতিক নিয়ম অনুসারেই হইয়া যায়। অথবা, জগতের নিয়ম পুণ্যপাপের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন?

বৈজ্ঞানিক এই প্রশ্ন তোলেন না। তাঁহার পক্ষে সত্যই যথেষ্ট, সত্যের আবার মূল্য দেখার প্রয়োজন নাই। জগতে যাহা ঘটে, তাহা ঘটে; তাহার দরুন কোথাও পাপের শাস্তি আর কোথাও পুণ্যের পুরস্কার হয় কি না, দেখা নিষ্প্রয়োজন। আর, সমস্ত জগতের গতি পাপের ক্ষয় এবং পুণ্যের জয় প্রতিষ্ঠার দিকে চলিয়াছে—এরূপ মনে করিবারও কোনো প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন নাই বলিয়াই বৈজ্ঞানিক এ প্রশ্ন তোলেন না; আর তোলা হইলেও তিনি উহা উপেক্ষা করিয়া চলেন।

কিন্তু দর্শনে এই প্রশ্ন উপেক্ষা করা চলে না। দর্শন সমগ্র বিশ্বের বিচার করে; মানুষের বিচারও করে; আর মানুষের মনে যে ন্যায়-অন্যায় বোধ রহিয়াছে, তাহাও সে উপেক্ষা করিতে পারে না। সমস্ত জগৎ যদি নীতি

ও ধর্মের বিরোধী হয়, তবে মানুষের নীতি ও ধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধা আছে তাহার মূল্য কতটুকু? কাজেই জাগতিক নিয়ম নৈতিক নিয়মের পরিপন্থী কি না, এ প্রশ্নের বিচার দর্শনের পক্ষে অনিবার্য। জগৎটা ধর্মের সহায়ক, সাধুর বন্ধু এবং পাপের ও অসাধুর শত্রু কি না, ইহাই প্রশ্ন।

জগতে অনেক ঘটনাই সাধু-অসাধু-নির্বিশেষে ঘটিয়া যায়। সূর্য আলো দেয়—অসাধুকে বঞ্চিত করিয়া নয়। বন্যায় মহাপ্রাণ সাধুর কুটিরও ভাসিয়া যায়। রোগ মহর্ষি এবং পরমহংসকে স্পর্শ করিতে দ্বিধা করে না। শুধু তাহাই নয়; অসাধুর গুলিতে কিংবা ছুরিকার আঘাতে সাধুরও প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে। সাধুর বুকে অসাধুর ছুরি বিদ্ধ হয় না, এমন নয়। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, জগৎ ন্যায়-অন্যায় ও ধর্ম-অধর্মের প্রতি উদাসীন।

আরও একটা কথা। যে সব প্রবৃত্তি এবং ক্রিয়া মানুষের নীতি-শাস্ত্র মহৎ বলিয়া মনে করে, মানুষের নিচে প্রাণীজগতের এবং প্রাণীজগতের বাহিরে বৃহত্তর জগতে তাহার কোনো স্থান আছে কী— আদৌ কোনো অস্তিত্ব আছে কী। অহিংসা, ক্ষমা, পরোপকার প্রভৃতি নীতিশাস্ত্র অনুসারে মহৎ গুণ। মানব-জগতেই তো ইহাদের স্থান কত সংকীর্ণ, আর মানব-সমাজের বাহিরে ইহাদের আদৌ কোনো অস্তিত্বই আছে কি না সন্দেহ। যীশুর নীতিতে ডান গালে চড় খাইয়া বাম গাল ফিরাইয়া দেওয়া মহৎ আদর্শ। কিন্তু প্রাণী-জগতে উহা কোথায় আছে। কোনো জন্তুই শক্তিতে কুলাইলে অপর জন্তুকে আঘাত করিতে বিরত হয় না; আর আহত হইলে পিপীলিকাও কামড়ায়।

প্রাণীজগতের বাহিরের জগতে অহিংসাকে উচ্চ স্থান দেওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। যদি এমন হইত যে, অহিংস এবং ত্যাগী ব্যক্তি সময়মতো বেশি বৃষ্টি বা বেশি রোদ বা বেশি ফসল পায়, তাহা হইলে মনে করা চলিত, জগৎ অহিংসাকে বড়ো বলিয়া দেখাইতে চায়। কিন্তু তাহা তো নয়। তাহা হইলে পুণ্যাপুণ্য বিভেদের যে বিরাট সৌধ মানুষ নির্মাণ

করিয়াছে, তাহার ভিত্তি কোথায়। জগতের অখণ্ডনীয় এবং অনম্য নিয়মের মধ্যে তো উহা দেখা যায় না।

কেহ কেহ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, মানুষ যখন জগতের নিয়ম অনুসারেই আবির্ভূত হইয়াছে, তখন তাহার মনে যে নীতি-জ্ঞান উদ্ভূত হইয়াছে তাহাও জগতের নিয়ম অনুসারেই ঘটিয়াছে; সুতরাং জাগতিক নিয়ম তাহার বিরোধী নয়। কিন্তু এই পর্যন্তই; জগতের নিয়ম ইহাকে সাহায্যও করিবে, এমন নয়। বৃহত্তর বাহ্য জগতে অরণ্য আছে, কিন্তু উদ্যান নাই। অথচ মানুষ উদ্যানের সৃষ্টি করিতে পারে। জগতের নিয়ম অনুসারেই বীজ হইতে গাছ হয়— অরণ্যেও হয়, উদ্যানেও হয়। সেই হিসাবে উদ্যান জগতের নিয়মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অন্যদিকে দেখা যায়, উদ্যানের যত্নপুষ্ট গাছপালাকে বাহিরের অধিকতর শক্তিশালী বৃক্ষলতা পিষিয়া মারিতে চায়। ইহা ছাড়াও প্রকৃতিতে উদ্যানের শত্রু আরও আছে— যেমন, পোকা মাকড় ইত্যাদি। মানুষ চেষ্টা করিয়া উদ্যান করে বটে, কিন্তু মানুষের চেষ্টা না হইলে উদ্যান কোথাও হইত না এবং তাহার যত্ন একটু শিথিল হইলে উদ্যান থাকেও না। জাগতিক নিয়ম প্রকাশ্যে উদ্যানের বিরোধী না হইলেও উহার সহায়কও নয়।

ঠিক তেমনই, মানুষের মনে নীতিজ্ঞানের উদয় হইয়াছে এবং মানুষের যত্নেই উহা রক্ষিত হইতেছে। আর যতদিন মানুষ শখ করিয়া বাগান রাখার মতো উহাকে রাখিতে চাহিবে ততদিন উহা থাকিবে, তাহার বেশি নয়। জগতের নিয়ম অনুসারে মানুষের মনে হিংসার উদ্রেক হয়; স্বাভাবিক ভাবে মানুষ বেশ স্বার্থপর; কিন্তু তথাপি সে অহিংসা এবং স্বার্থত্যাগকে বড়ো করিয়া দেখে—যেমন বনফুলের চেয়ে বাগানের ফুলকে; আর যতদিন তেমনই দেখিবে ততদিন সে নিজের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াও স্বার্থ সংকুচিত করিয়া পরার্থে ত্যাগ করিবে। সভ্যতার ভিত্তি এই ত্যাগের উপর। কিন্তু বাবুর বাগানের

শখের মতো কতদিন মানুষের এই শখ থাকিবে, বলা কঠিন। যদি কখনও উহা না থাকে, তবে সভ্যতার লোপ হইবে, মানুষ আবার পশু হইয়া যাইবে।

নীতি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত নীতিকে অত্যন্ত ভঙ্গুর করিয়া রাখে। শুধু শখের জিনিস হিসাবে নীতিকে স্থায়িত্ব দেওয়া কঠিন। প্রবল ঢেউয়ের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটার একটা আনন্দ থাকিতে পারে, কিন্তু সে কতক্ষণ। প্রবল বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মের বিপক্ষে কতকাল লড়াই করা চলে? বাগান করার শখের মতো শখের চেয়ে আর দৃঢ়তর ভিত্তি কি ধর্মাধর্মের নাই।

মানুষ যাহাকে উচ্চ মনোবৃত্তি মনে করে, বাহ্য জগতে বাস্তবিকই কি তাহার কোথাও স্থান নাই। বাহিরের জগতেও স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি একেবারেই নাই, এমন নয়। ফুল যে ফল দেয়, পশু-জননী যে মা হয়, তাহার ভিতর একটা বিরাট আত্মত্যাগ রহিয়াছে। মাতৃত্ব মানেই একটা প্রকাণ্ড ত্যাগ। তারপর, পিপীলিকার জগতে, মৌমাছিদের রাজ্যে কত না সুন্দর নীতি দেখা যায়। তাহারা একে অন্যের সহায়তা করে, নিয়ম মানিয়া চলে, মৃতের সৎকার করে; যে সব কাজ মানুষ বড়ো মনে করে, ইহারাও তো তাহা করে।

প্রাণীজগতের বাহিরে বৃহত্তর জড় জগৎও হয়তো মানুষের নীতি-নিয়মের প্রতি একেবারে উদাসীন নয়। স্বাস্থ্যের নিয়ম জগতের নিয়ম; ভঙ্গ করিলে রোগ হয়। পাপেও রোগ হয়। পবিত্র সংযত জীবনে সুখ ও স্বাস্থ্য বর্তমান থাকে। সংযম ও পবিত্রতা যে বড়ো, জগতের নিয়ম তাহাই স্মরণ করাইয়া দেয়। বন্যায় বা ভূমিকম্পে যে দেশ ধ্বংস হইয়া যায়, তাহাও সে দেশের লোকের পাপের ফল—এ বিশ্বাস প্রাচীনকালে খুবই প্রবল ছিল এবং এখনও অনেকের মনে আছে। মানুষের ইতিহাসে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষে—কুরুক্ষেত্রে কিংবা অন্য যুদ্ধক্ষেত্রেও—ধর্মই জয়ী হয়, ইহা জ্যামিতির প্রমাণের মতো প্রমাণ করিতে না পারিলেও বিশ্বাস করার মতো যুক্তি আছে।

অনেক সময় এমন দেখা যায়, পাপের শাস্তি হইল না। পাপের পর পাপ,

অন্যায়ের পর অন্যায় করিয়াও মানুষ খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সম্মানের অধিকারী হয়। জাতির বেলায়ও দেখা যায়, পরস্ব যে অপহরণ করে, পরের দেশ যে লুণ্ঠন করে, সে জাতি সাম্রাজ্যের মালিক হয়; কোনো শাস্তি পায় না—কোনো অসুবিধাও ভোগ করে না। মানুষের সমাজ-গঠনের ত্রুটির জন্য ব্যক্তির পাপ সব সময় রোধ করা যায় না; আর, বিশ্বমানবের কোনো সমাজই নাই বলিয়া জাতির পাপস্পৃহাও দমন করা যায় না; ইহা ঠিক। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, জগৎটা একটা সমাপ্ত কারু-শিল্প কিংবা পূর্ণাঙ্কিত ছবি নয়। ইহাতে এখনও নূতন ঘটিবার অবসর আছে। ইহা ক্রমশ ভূয়মান, ক্রমশ প্রকাশমান, ক্রমশ বর্ধমান। শিশুর দেহ যেমন ক্রমশ বাড়ে, মন যেমন ক্রমশ উন্নত হয়, তেমনই এই জগৎটাও ক্রমশ ভালো হইতে আরও ভালো হইবে। ইহার গতি ক্ষান্ত হয় নাই এবং গতি ক্রমশ উন্নতির দিকে। একদিন এমন একটা জগতের আবির্ভাব হয়তো হইবে যাহাতে কোনো পাপ, কোনো অন্যায়, কোনো অনিয়ম থাকিবে না। এক দিন দুই দিনে না হইতে পারে, কিন্তু যুগ-যুগান্তর, কল্প-কল্পান্তর পরে হইলেও এই পরিণতি ঘটিবেই এরূপ বিশ্বাস মানুষ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে এই বিশ্বাস শুধু কবির স্বপ্ন নয়, দার্শনিকের সিদ্ধান্ত হিসাবে দর্শনে ও সাহিত্যে প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের সমাজ যে ক্রমশ অধিকতর ভদ্র, অধিকতর সভ্য হইতেছে, ইহা অনেকের নিকটই প্রমাণিত সত্য। তাহা হইলে জগৎ-যন্ত্র যে ধর্মের সহায়ক, জগতের গতি যে সত্যের অনুগামী, সুনীতির পক্ষপাতী, উহা যে পাপপুণ্যের প্রতি উদাসীন নয়, ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়ায়।

কর্মবাদ

ভারতীয় দর্শনের কর্মবাদেও আমরা এই সত্যের উপলব্ধি দেখিতে পাই। মানুষ যে কর্ম করে তাহার ফল তাহাকে ভুগিতে হয়। কার্য-কারণের অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে কর্ম তাহার ফল প্রসব করে; সৎকর্মের ফল ভালো, আর অসৎকর্মের ফল মন্দ। জগতের নিয়ম অনুসারেই এই সব ফল উপজাত হয়; সুতরাং জগতের নিয়মই মন্দকে মন্দ ফল দিয়া শাস্তি দেয়, আর পুণ্যকেও তেমনই পুরস্কৃত করে। এক জীবনে সব কর্মের ফলভোগ সম্ভব হয় না; আবার নূতন কর্মও সঞ্চিত হয়। সুতরাং জন্মান্তরে ইহার ভোগ হইবে এইরূপে জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া মানুষ নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করিয়া চলিয়াছে। ইহা হইতে মুক্ত হওয়ার উপায় দর্শন চিন্তা করিয়াছে। কিন্তু মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই প্রবাহ চলিবে। ইহজন্মের পাপের শাস্তি কিংবা পুণ্যের পুরস্কার এখানে যদি নাই হয়, জন্মান্তরে হইবে। কর্মকে অতিক্রম করিবার, ফাঁকি দিবার কোনো উপায় নাই। জগতের নিয়মের মধ্যে পাপপুণ্যের বিচার অনতিক্রমণীয় হইয়া রহিয়াছে। আজ হউক, কাল হউক, জন্মান্তরে হউক, অলঙ্ঘ্য বিধি অনুসারে কৃতকর্মের ফল মানুষ পাইবেই; আর, সুকৃতের ফল যে ভালো, ইহাও জগৎ-বিধানে নির্দিষ্ট রহিয়াছে।

জগতের উপাদান ও উৎপত্তি

সৎ-অসতের প্রতি অনিরপেক্ষ যে জগৎ, তাহার উপাদান কী। কী দিয়া উহা নির্মিত হইয়াছে। জড়, অচেতন পরমাণু, না আর কিছু? প্রশ্নটা অতি প্রাচীন এবং এখনো ইহা লইয়া বিতর্ক চলে। বিজ্ঞান এতদিন অচেতন পরমাণুকে এই চরাচর বিশ্বের উপাদান মনে করিত। কিন্তু ইদানীং আবার বিজ্ঞানের কাছেই এই পরমাণু একটা শক্তিকেন্দ্রে পর্যবসিত হইয়াছে। জড়ের

সত্তা দর্শন অনেকবার অস্বীকার করিয়াছে। বিজ্ঞানেরও আধুনিক গতি দেখিয়া মনে হয়, শেষ পর্যন্ত জড়কে রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িবে। জগতের উপাদান শেষ পর্যন্ত কোন্ প্রকারের— এই প্রশ্ন এখনো গভীর আলোচনার বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

আর, এই যে উপাদান, উহা অনাদি, না, আরব্ধ, ইহাও একটা প্রশ্ন। অনেকে মনে করিয়াছেন, জগতের উপাদান অনাদি—কোনো এক সময়ে উহার সৃষ্টি হইয়াছে এমন নয়, আর এই অনাদি উপাদান লইয়া স্রষ্টা জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন; শিল্পী যেমন বাহির হইতে উপাদান লইয়া শিল্প নির্মাণ করে, তেমনই। জগতের একজন শক্তিমান্ স্রষ্টা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই মত গ্রহণ করা কঠিন; কারণ, ইহাতে উপাদানের জন্য স্রষ্টাকে সাধারণ শিল্পীরই মতো পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। সেইজন্য দর্শনের সাধারণত গৃহীত অভিমত এই যে, যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, জগতের উপাদানও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে এই সৃষ্টিক্রিয়া কোনো এক সময়ে আরব্ধ ও কোনো এক সময়ে সমাপ্ত না হইয়া একটা অনবচ্ছিন্ন ক্রিয়া হইতে পারে, সূর্য যেমন অনবরত আলো দিয়া যাইতেছে, তেমনই।

জগতের উৎপত্তি কী প্রকারে হইয়াছে— অথবা উহার নির্মাণ-প্রণালী কী, ইহা লইয়াও অনেক বিতর্ক হইয়াছে। বিজ্ঞান এক সময় ভাবিত, অনাদি জড় পরমাণুর মধ্যে অন্ধ অচেতন প্রাকৃতিক শক্তি নানাভাবে ক্রিয়া করিয়া এই চেতন-অচেতন-সমন্বিত চরাচরের সৃষ্টি করিয়াছে। এই পরমাণুসমূহকে এক সময়ে অবিভাজ্য মনে করা হইত; কিন্তু এখন ইহারা বিভাজ্য হইয়াছে এবং শক্তিকেন্দ্রে পর্যবসিত হইয়াছে। তথাপি জগৎ-উৎপত্তির প্রণালী একই রহিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ এইসব পরমাণু বা শক্তিকেন্দ্র নানাভাবে সক্রিয় হইয়া এই জগতের জন্ম দিয়াছে। সোজা কথায়, বিজ্ঞান সৃষ্টি মানে, স্রষ্টা মানে না। এইখানে দর্শনের সঙ্গে তাহার প্রভেদ রহিয়াছে।

দর্শনের মতে উপাদানের কথাটাই বড়ো নয়, কর্তা, নিমিত্ত কারণ বা স্রষ্টা বড়ো। এই স্রষ্টা চেতন; জড় প্রকৃতি নয়। আর অনেকের মতে জগতের উপাদানও স্রষ্টা হইতে ভিন্ন নয়। স্রষ্টাকে যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন—ব্রহ্ম বা ভগবান্ বা ঈশ্বর—তিনিই জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত, উভয়ই। পৃথিবীতে তিনি নিজেকেই প্রকাশিত করিতেছেন। সাধারণ শিল্পীর শিল্পের মতো সৃষ্টি স্রষ্টা হইতে পৃথক নয়; স্রষ্টা সৃষ্টির সর্বত্র—প্রতি অণুতে— সর্বদা রহিয়াছেন। উহা তাঁহার আত্মপ্রকাশ। সূর্য যেমন নিজের কিরণেতে নিজেকে প্রকাশ করে, ঠিক সেইরূপ।

এই সৃষ্টি কেন হইয়াছে। কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। সৃষ্টির ক্রমিক গতি—নূতন নূতন জিনিসের আবির্ভাব, নূতন জীবের উৎপত্তি— ইত্যাদি—পর পর জগতের ইতিহাসে যাহা ঘটিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, কোনো একটা পরিণতির দিকে বিশ্ব অগ্রসর হইতেছে। কী সে উদ্দেশ্য— স্রষ্টার অভিপ্রায় কী। তাহা মানুষের সসীম জ্ঞানের কাছে গূঢ় রহিয়াছে। একটা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির চেষ্টা যে হইতেছে তাহার ইঙ্গিত জগতের গতির মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু কী সে উদ্দেশ্য, তাহা আমাদের পক্ষে ধরা কঠিন।

অনেকে আবার মনে করিয়াছেন যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য স্রষ্টা কাজ করিতেছেন ভাবিলে তাঁহাকে অপূর্ণ মনে করা হয়। যাহার একটা কিছু চাই, তাহার তো অভাব রহিয়াছে সে তো অপূর্ণ। স্রষ্টাকে সেরূপ ভাবা চলে না। সুতরাং জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহাতে কোনো প্রয়োজনের প্রশ্ন উঠে না। উহা লীলা মাত্র। ভারতীয় দর্শন সাধারণত এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছে।

জগতের সত্যতা

যে বিশ্বে আমরা বাস করিতেছি, উহা কি সত্য, না, একটা মায়া মাত্র। নেক সময়ই তো আমরা ভুল দেখি কিংবা ভুল শুনি। গোটা জগৎটা সম্বন্ধে য ধারণাটা আমরা করিয়া বসিয়াছি, তাহাও একটা প্রকাণ্ড ভুল নয় তো? প্নে আমরা কত কিছু দেখি; জাগিয়াই সে সমস্তকে অলীক মনে করি। তমনি এখন জগৎটাকে আমরা যাহা ভাবি, উচ্চতর জ্ঞানলাভের পর উহা লীক প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে না কি। অনেক দার্শনিক তাহাই মনে রিয়াছেন। এই যে জগৎ, এই যে সংসার, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, স্ত্রী পুত্র রিবার,—এ সমস্তই মায়ার খেলা; একটা ভেল্কি, একটা ইন্দ্রজাল। পরিপূর্ণ চ্চতর জ্ঞানলাভ করিলেই উহার অলীকত্ব ধরা পড়িবে।

ইহার বিরুদ্ধ মতও রহিয়াছে। অনেকে বলেন, আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে ল-ভ্রান্তি হয় ঠিকই; কিন্তু সে সব শোধরাইয়া লইবার উপায়ও আমাদের াতে আছে। এইভাবে পরিশোধিত জ্ঞানে আমরা জগৎকে যেভাবে জানি াহা অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নাই। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য গ্রহণের অযোগ্য য়; সুতরাং জগৎকে যেরূপ দেখি, উহা তাহাই।

এই দুইটি পরস্পর-বিরুদ্ধ মতের মধ্যে একটা মধ্যপন্থাও আছে। জগৎটা ম্পূর্ণ অলীক নয়, যেমন দেখি ঠিক তেমনও নয়। সাধারণ মানুষ উহাকে ভাবে দেখে তাহাতে ভুল আছে। বিচার দ্বারা ইহাকে বুঝিলে কতকটা ন্যরকম দেখাইবে। এই বিচার-লব্ধ জগৎই প্রকৃত জগৎ। জগৎ বলিতে ামরা যে বাহ্য জগৎ আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহাকে যেমন ঝি, মানুষের আভ্যন্তরীণ জীবন, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, মানুষের ইতিহাস ত্যাদিও তেমনই বুঝি। এই সমস্ত জগৎটাকেই দার্শনিক সাধারণ মানুষের য়ে একটু পৃথক্‌ভাবে দেখেন। যুক্তি-পরিপুষ্ট, বিচার-শোধিত জগৎই প্রকৃত গৎ। দার্শনিকেরা সাধারণত এই জগৎই স্বীকার করেন।

৩

জীব

জগৎ সম্বন্ধে ভাবিতে বসিয়া ইহা বিস্মৃত হওয়া যায় না যে, যেভাবে সে আছে। সুতরাং ব্যক্তির অস্তিত্ব সহজেই স্বীকার করিয়া লওয়া যায়। মানুষের 'আমি'-বোধটা এত প্রবল যে, এই 'আমি' নাই, ইহা ভাবা তাহার পক্ষে অসম্ভব। এই 'আমি'কেই আমরা আত্মা বলিয়া অভিহিত করিতেছি। যে দেখে, শোনে, স্পর্শ করে, চিন্তা করে, মনে রাখে, কল্পনা করে, ভালোমন্দ বিচার করে— যাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভয় আছে, যে ঘৃণা ও প্রীতি দেখাইতে পারে, এক কথায় তাহাকেই আমরা আত্মা বলি। ভগবান হইতে পৃথক করার জন্য তাহাকে জীব বা জীবাত্মাও বলা হয়।

আত্মা ও মনের মধ্যে একটা প্রভেদ ভারতীয় দর্শন স্বীকার করিয়াছে। সেখানে মন আত্মার একটি ইন্দ্রিয়— একাদশ ইন্দ্রিয়। কিন্তু মনের ভিতর দিয়াই আত্মার প্রকাশ হয় বলিয়া রূপ আর রূপীর মতো উভয়ের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য এবং সেইজন্য সাধারণ ভাষায় এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও উভয় শব্দই একার্থে ব্যবহৃত হয়। এই আত্মা বা মনের ব্যবহারিক জীবনের আলোচনা মনস্তত্ত্বে হয়। ইন্দ্রিয় দ্বারা কী করিয়া জ্ঞান লাভ হয়, চিন্তার কী ধারা, স্মৃতি-বিস্মৃতির কী নিয়ম— ইত্যাদি প্রশ্ন মনস্তত্ত্বের আলোচ্য। কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে পারমার্থিক প্রশ্ন যাহা আছে তাহা দর্শনের নিজস্ব জিজ্ঞাসা। আত্মা কী, দেহের সঙ্গে এবং দেহের ভিতর দিয়া বাহ্য জগতের সঙ্গে উহার সম্পর্ক কী ধরনের এবং দেহাবসানের পর আত্মার কী গতি হয়—সাধারণত এই তিন দিক দিয়া আত্মার সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে।

আত্মা কি দেহের ক্রিয়া, না, দেহাতিরিক্ত ?

আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে একটা প্রধান প্রশ্ন এই যে, আত্মা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা কি দেহেরই ক্রিয়া-বিশেষ; না, দেহাতিরিক্ত একটা বস্তু।

দেহেতে বাস করিয়া দেহের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা জ্ঞান উপার্জন করি, আমরা চিন্তা করি, মনে রাখি, ইত্যাদি আত্মার যাহা কাজ তাহা করি। এ সম্বন্ধে কোনো মতভেদ কিংবা সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সমস্তই তো দেহের অংশবিশেষের— মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইতে পারে। ফুস-ফুস যেমন অনবরত শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে থাকে, যকৃৎ হইতে যেমন পিত্ত নিঃসৃত হয়, তেমনই মস্তিষ্ক হইতে চিন্তা ইত্যাদি ক্রিয়া নিঃসৃত হইয়া যায়, ভাবিতে দোষ কী। আর দেখাও তো যায়, মস্তিষ্কে আঘাত পাইলে মানুষ অজ্ঞান হইয়া যায়। সুতরাং মস্তিষ্ক ধ্বংস হইয়া গেলে, অর্থাৎ দেহের অবসান হইলে আত্মা নামক পদার্থ আর থাকিবে না, ইহা একেবারে অচিন্তনীয় নয়। এই ভাবে অতি প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত অনেকেই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। এই মতের সুবিধা এই যে ইহাতে আত্মা সম্বন্ধে দার্শনিক প্রশ্ন আর বিশেষ কিছু ভাবিতে হয় না।

কিন্তু দেহের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হইলেও আত্মা দেহের বা দেহের অংশবিশেষের ক্রিয়া মাত্র নয়, ইহা দেহ হইতে পৃথক একটা সত্তা,— এই বিশ্বাস এত প্রাচীন এবং প্রবল যে উহাকে উপেক্ষা করা যায় না। শুধু লোকে বিশ্বাস করে বলিয়াই দর্শন উহাকে সত্য বলিয়া মানিতে পারে না; এই বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তিও আছে। কোনোও একটা মত জানা থাকিলে, তাহার পক্ষে-বিপক্ষে কী যুক্তি হইতে পারে, তাহা চিন্তাশীলের পক্ষে আবিষ্কার করা একেবারে অসম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রেও যুক্তি কী, তাহা কতকটা

সহজেই অনুমান করা চলে। আত্মা যদি দেহের অংশবিশেষের ক্রিয়া মাত্র হইত, তাহা হইলে দেহের আকার এবং দৈহিক শক্তির উপর আত্মার শক্তিও নির্ভর করিত। বুদ্ধি প্রভৃতি আত্মার শক্তি মানুষের বেশি; কিন্তু মানুষের দেহ অনেক পশুর দেহ হইতে নিকৃষ্ট। আর, মানুষের মধ্যেও যে বলবান্ সেই খুব বুদ্ধিমান্‌ও হয় না। বার্ধক্যে মানুষের শারীরিক বলের ক্ষয় হয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শক্তিও সব সময়ই ক্ষীণ হয় না। মস্তিষ্কের পুষ্টির উপর মানসিক শক্তি নির্ভর করে, ইহা ঠিক; কিন্তু তাহাতে এই মাত্র প্রমাণিত হয় যে, মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র; যন্ত্র বিকল কিংবা অচল হইলে মনের ক্রিয়ার হানি হয়। কিন্তু তাই বলিয়া মস্তিষ্ক হইতেই মনের উদ্ভব, এ কথা বলা চলে না।

আত্মা দেহ হইতে পৃথক, ইহা প্রমাণ করার পক্ষে এই যুক্তিই যথেষ্ট নহে। দেহ ব্যতীতও আত্মার অস্তিত্ব সম্ভব, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে আত্মার পৃথকত্ব নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। যদি দেখানো যায় যে, দেহের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বেও আত্মা ছিল অথবা যদি দেখানো যায় যে, দেহের মৃত্যুর পরও আত্মা থাকে অথবা যদি এই দুইটিই প্রমাণ করা যায়, তাহা হইলে আত্মা যে দেহ হইতে পৃথক তাহা অস্বীকার করার আর উপায় থাকে না। বলা বাহুল্য, এই দুইটিই প্রমাণ করার চেষ্টা হইয়াছে।

অনাদিত্ব ও অবিনাশিত্ব

বর্তমান দেহে আসিবার পূর্বেও আত্মার অস্তিত্ব ছিল, এই যাঁহাদের মত, তাঁহাদের মতে আত্মা অনাদি, কোনোও এক সময়ে তাহার সৃষ্টি বা জন্ম হয় নাই। আর, মৃত্যুর পরও আত্মা বর্তমান থাকিবে, এই যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মতে আত্মা অবিনাশী। যাহার আদি বা আরম্ভ নাই, তাহার অন্ত বা বিনাশও নাই—এই নিয়ম অনুসারে যাঁহারা আত্মাকে অনাদি বলেন,

তাঁহারা উহাকে অবিনাশীও বলিতে বাধ্য এবং বলিয়াও থাকেন। কিন্তু ইহার বিপরীতটি ঠিক নয়। অর্থাৎ এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা আত্মাকে অবিনাশী বলেন কিন্তু অনাদি বলিতে প্রস্তুত নহেন। খ্রীস্টান ও মুসলমান ধর্মে এবং ওই সব ধর্ম দ্বারা প্রভাবান্বিত দর্শনে আত্মাকে সৃষ্ট মনে করা হয়। এই দেহের সঙ্গে সঙ্গেই উহার উদ্ভব হইয়াছে; পূর্বে ছিল না; কিন্তু পরে থাকিবে; দেহের মৃত্যুর সঙ্গেই আত্মারও মৃত্যু হইবে না। অর্থাৎ আত্মা অনাদি নয়, কিন্তু অবিনশ্বর। দেহ-বাসের পূর্বে আত্মার অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ খুব স্পষ্ট নয়; অথচ আত্মার প্রকৃতি এবং দেহের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক চিন্তা করিলে মনে হয়, দেহের সঙ্গেই তাহার ধ্বংস হইবে না। এই যুক্তির উপরই আত্মা যে অবিনশ্বর, এই মত প্রতিষ্ঠিত।

যাঁহারা আত্মাকে অনাদি বলেন, তাঁহাদের যুক্তি এই যে, আত্মার পূর্ব অভিজ্ঞতা ও সংস্কারের প্রমাণ পাওয়া যায়। দেহের পরিপূর্তির সঙ্গে সঙ্গে সে উহাকে ব্যবহার করিতে পারে; পূর্ব অভিজ্ঞতা ও সংস্কার না থাকিলে উহা সম্ভব হইত না। সুতরাং এই দেহে আসিবার পূর্বেও আত্মা ছিল এবং এইপ্রকার দেহে পূর্বেও সে বাস করিয়াছে। আর, ইহার পূর্বে আত্মা কিছুদিন মাত্র ছিল, মনে করিবার কোনো যুক্তি নাই; সুতরাং অনাদিকালই ছিল। কাজেই আত্মা অনাদি; এবং অনাদিকাল ভিন্ন ভিন্ন দেহে বাস করিয়া আসিতেছে।

বর্তমান দেহের অবসানের পরও যে আত্মা বিদ্যমান থাকিবে, তাহার যুক্তি উভয়ত্রই এক। আত্মা অমর, এই বিশ্বাস মানবসমাজে সভ্যতার আদি হইতেই দেখা যায় এবং অত্যন্ত ব্যাপকভাবে দেখা যায়। এত লোকে যাহা সত্য বলিয়া মানে, তাহা কি অসত্য। ইহাও আত্মার অমরত্বের পক্ষে একটা যুক্তি। তাহা ছাড়া আরও যুক্তিও উদ্ধৃত হয়। পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের শাস্তি অনেক সময়ই এই জন্মে হয় না; অথচ, ইহা হইবে না, ভাবিতে

পারা যায় না। কাজেই এই পুণ্যপাপের ফলের ভোক্তা আত্মা থাকিবে। তারপর আত্মা কতকগুলি শক্তি লইয়া আসে; তাহাদের পূর্ণ বিকাশ এখানেই হয় না; সুতরাং ইহাদের পূর্ণতার জন্যও আত্মাকে দেহের পরও বাঁচিতে হয়। আত্মার প্রকৃতি অনুধাবন করিলেও তাহাকে অমর মনে করিতে হয়। জাগতিক বস্তুর ধ্বংসের অর্থ উহার উপাদানে বিলীন হইয়া যাওয়া। যে সব উপাদান দ্বারা বৃক্ষ নির্মিত হইয়াছে, বৃক্ষ যদি আবার সেই সেই উপাদানে বিলীন হইয়া যায়, তাহা হইলেই বৃক্ষ আর থাকে না। কিন্তু আত্মা এইরূপ কতকগুলি সূক্ষ্ম উপাদানের সাহায্যে নির্মিত স্থূল বস্তু নয়। সুতরাং উহার ওই প্রকারে বিলয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য উহার ধ্বংসও নাই।

পরলোক

এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তি দ্বারা আত্মার অবিনাশিত্ব প্রমাণ করা হয়। মৃত্যুর পরও আত্মা কোনো এক জায়গায়—কোনো লোকে—কোনো এক ভাবে বিদ্যমান থাকিবে, এই বিশ্বাসেরই নামান্তর পরলোকে বিশ্বাস। পরলোক সম্বন্ধে ধর্মশাস্ত্রে এবং প্রাকৃতজনের বিশ্বাসে অনেক রকম ধারণা দেখা যায়। পরলোক আবার দ্বিধাবিভক্ত হইয়া থাকে— স্বর্গ ও নরক। কখনো ইহার অধিক বিভাগের কথাও শোনা যায়। পুণ্যবান্ স্বর্গে যান— স্বর্গের সুখভোগ করেন, আর পাপী নরক-যন্ত্রণায় পাপের শাস্তির আস্বাদ পায়,— এ কথা যে-কোনো লোককে জিজ্ঞাসা করিলেই হয়তো বলিবে। বলা প্রয়োজন যে, এসব ক্ষেত্রে বিশ্বাস যে পরিমাণে প্রবল, প্রমাণ সেই পরিমাণে দুর্বল। বিজ্ঞান লেবরেটরিতে যে ভাবে পরমাণুর গঠন কিংবা বিদ্যুতের ক্রিয়া প্রমাণ করে, সেইরূপ কোনো প্রমাণ পরলোকের সম্বন্ধে পাওয়া যায় নাই। কিংবা কোনো ভূপর্যটক কোনো অজানা দেশের যেরূপ

বিবরণ দেয়, স্বর্গ-নরকের সেরূপ বিশ্বাসযোগ্য কোনো বিবরণও পাওয়া যায় নাই।

পরলোকের স্পষ্ট বর্ণনা না পাওয়া গেলেও পরলোক যে আছে, তাহা নিশ্চিতভাবে জানিতে পারিলেও হইত। কিন্তু সেখানেই কি নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রেতাত্মা বা কোনো মৃত ব্যক্তির আত্মা আছে দেখাইতে পারিলেও একটা অবর্ণিত পরলোকের সত্তা মানা যাইত। কিন্তু সেখানেও খুব জোর প্রমাণ নাই। অধুনা অনেক জায়গায় অনেক প্রেতাত্মা-বিষয়িণী অনুসন্ধান-সমিতি কোনো মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ডাকিয়া আনিয়া সে যে বর্তমান আছে, লোপ পায় নাই, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই ভাবে বিদ্যাসাগরের কিংবা দেশবন্ধুর আত্মার সাময়িক আবির্ভাবের কথা আমরা অনেক সময় শুনি। প্রশ্নটা বিচারাধীন; নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া গেলেও একেবারে অবিশ্বাস করার মতো কিছু ঘটে নাই; মানুষের জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় মনে হয়, এই পর্যন্ত বলিলেই দর্শনের পক্ষে যথেষ্ট হয়।

আত্মা অমর, এই বিশ্বাসের সঙ্গে মানুষের সুখ-দুঃখ এমন ভাবে জড়িত যে, উহাকে উপেক্ষা করা কঠিন এবং বিরুদ্ধে নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এই বিশ্বাস ত্যাগ করাও কঠিন। প্রিয়জন বিয়োগে এই বিশ্বাস কত বড়ো সান্ত্বনা দেয়, তাহা সহজেই কল্পনা করা যায়। কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞানের পক্ষে অপ্রিয় সত্য বলা অনিবার্য। সুতরাং হাজার প্রিয় হউক, হাজার সান্ত্বনাদায়ক হউক, বিশ্বসিত বস্তুর পক্ষে প্রমাণ না পাওয়া গেলে সে কথা দর্শনকে বলিতেই হইবে। দর্শনের কাছে সত্যই বড়ো সান্ত্বনা। অবশ্যই মানবসমাজে ব্যাপকভাবে বর্তমান বিশ্বাসকেই যাঁহারা প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

জন্মান্তর

পরলোক আছে, আত্মা অমর,—ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেই আমাদের সকল ল্যাঠা চুকিয়া যায় না। অমর আত্মার দেহাবসানের পরবর্তী জীবনটা কিরূপ, এই প্রশ্ন থাকিয়া যায়। প্রেতাত্মা পরলোকে গিয়া ইহলোকে পরিত্যক্ত প্রিয়জনের আগমনের প্রতীক্ষায় বিরহী যক্ষের বিরহিণী পত্নীর মতো বসিয়া বসিয়া শুধু দিন গনিবে—না, তাহার অন্যপ্রকার জীবন আরম্ভ হইবে? প্রশ্নটা এত জটিল যে, ইহার স্পষ্ট এবং ছল-বিহীন এবং হেত্বাভাস-মুক্ত উত্তর খুব কমই পাওয়া যায়। যাঁহারা প্রেতাত্মাকে আহ্বান করিয়া সাড়া পান, তাঁহারা ধরিয়া লন যে মৃত ব্যক্তির আত্মা তাঁহারই নাম-গোত্র বহন করিতে থাকে। বিদ্যাসাগরের আত্মা এখনো বিদ্যাসাগরই রহিয়া গিয়াছে; এখানকার ঘর-দুয়ার আত্মীয়স্বজন সকলের কথাই মনে আছে; এ সকলের প্রতি মমতাবোধও রহিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি তাহাই। আত্মার কি আর দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটে না। কিংবা আর কোনো অবস্থান্তর নাই?

খ্রীস্টান ও মুসলমান ধর্ম এবং খ্রীস্টান ধর্মে অনুপ্রাণিত পাশ্চাত্য দর্শন আত্মার পূর্বজন্মও মানে না, দেহান্তরপ্রাপ্তিও মানে না। এই দেহেই তাহার একমাত্র দেহবাস। ইহার আগে সে ছিল না। এই দেহের সঙ্গে সে সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু দেহের সঙ্গেই সে মরিবে না। মৃত্যুর পর অনন্ত জীবন তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু আর তাহাকে কোনো দেহে প্রবেশ করিতে হইবে না। ভবিষ্যৎ জীবন দেহহীন জীবন।

ভারতীয় দর্শনে অন্যরূপ কথা পাই। আত্মা বর্তমান দেহে আসিবার পূর্বে আরও ভিন্ন ভিন্ন দেহে বাস করিয়া আসিয়াছে। আর, ভবিষ্যতেও অর্থাৎ এই দেহের অবসানের পরও আবার দেহান্তর লাভ করিবে। সব

সময় মানুষের দেহ হইতে মানুষের দেহেই প্রবেশ করিবে, এমন নয়। পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি বৃক্ষলতার দেহেও তাহাকে প্রবেশ করিতে হইতে পারে। দেহ হইতে দেহান্তরপ্রাপ্তি ঠিক জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণের মতো আত্মার ভাগ্যে অনবরতই ঘটিয়া যাইতেছে।[১] কখন কোন্ দেহ হইতে কোন্ দেহে প্রবেশ করিবে, তাহা নিয়ন্ত্রিত হয় আত্মার সঞ্চিত কর্ম দ্বারা। এই যে দেহ হইতে দেহান্তর গমনরূপ অনাদি প্রবাহ তাহাতে প্রত্যেক দেহেতে বাস করিবার সময়ই আত্মা ভালোমন্দ নানারকম কাজ করিয়া যায়। তাহার কতকগুলির ফলভোগ হইয়া যায়, আর কতকগুলি সঞ্চিত থাকে। তাহা দ্বারা পরবর্তী দেহ কিরূপ হইবে, তাহা নির্ণীত হয়। সমাজে মানুষে মানুষে যে শক্তি ও সৌভাগ্যের প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ প্রত্যেকের প্রাক্তন বা পূর্ব পূর্ব জন্মের ভুক্তাবশিষ্ট সঞ্চিত কর্মফল। আর, এই জীবনে যদি কোনো পাপী শাস্তি না পায় কিংবা পুণ্যবানের পুণ্য পুরস্কৃত না হয়, তবে তাহা জন্মান্তরে তাহাদের প্রত্যেকের দেহ, সামাজিক প্রতিপত্তি, বংশমর্যাদা ইত্যাদিতে প্রকাশ পাইবে।

মুক্তি

এই যে কর্ম দ্বারা নিয়মিত জীবনপ্রবাহ, ইহা অনাদি হইলেও অনন্ত নহে। চেষ্টা করিলে জীব ইহার সমাপ্তি ঘটাইতে পারে। দেহ হইতে দেহান্তরে বাস খুব আরামের নয়; ইহাতে দুঃখ আছে। যে বুঝে সে এই দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে হয়তো চাহিবে। এইপ্রকার মুমুক্ষা যাহার হইবে, তাহার মুক্তির উপায় দর্শন চিন্তা করিয়াছে। কেহ যদি মুক্তি না চায়, কেহ যদি এই জীবনপ্রবাহেই আনন্দ পায়. তবে তাহাকে মুমুক্ষু

১ ভগবদ্গীতা, ২।২২

করিবার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু জ্ঞানলাভ হইলে, সদসৎ বিবেচনা করিবার শক্তি হইলে, জীবন যে দুঃখময় ইহা মানুষে বুঝিবে, ভারতীয় দর্শন এরূপ বিশ্বাস করিয়াছে। আর, সেই অনুসারে দর্শন মুক্তির উপায়ও চিন্তা করিয়াছে। শুধু দর্শন নয়, ধর্মশাস্ত্রেও ইহা উপদেশ্য বিষয়। এইখানে নানা মুনির নানা মত দেখা দিয়াছে। মুক্তির উপায় অনেক রকমে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু দর্শন সাধারণত জ্ঞানকেই প্রধান স্থান দিয়াছে। জ্ঞান সমস্ত কর্ম পোড়াইয়া দিয়া মুক্তি আনয়ন করে।[১] জ্ঞান অর্থে এইখানে পদার্থবিদ্যা কিংবা গণিতের জ্ঞান নয়, উহা তত্ত্বজ্ঞান, পারমার্থিক সত্যের জ্ঞান,—এক কথায়, দার্শনিক জ্ঞান।

কর্মজনিত জীবনপ্রবাহ হইতে মুক্ত হইলে আত্মার বিলয় হয় না; তখনই তাহার সত্যকার পরলোক আরম্ভ হয়। এই পরলোকে আত্মার অস্তিত্ব ঠিক কোন্ ধরনের তাহা লইয়াও অনেক সূক্ষ্ম বিচার হইয়াছে; তবে উহার স্বরূপ বর্ণনা করা ভাষার প্রকাশ-শক্তির বাহিরে, এরূপ মনে করাই বোধ হয় বিজ্ঞতম পন্থা।

আত্মা সম্বন্ধে যে সব বিভিন্ন মত রহিয়াছে—তাহার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সম্বন্ধে যে সব ধারণা রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিরাট বিচার-ব্যূহ রচিত হইয়াছে। কিন্তু কোনো সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে, এ কথা বলা দুঃসাহসের কাজ। দার্শনিকের বিচারেই আনন্দ, খেলায় মত্ত খেলোয়াড়ের যেমন, সিদ্ধান্তটাই তাঁহার কাছে বড়ো কথা নয়।

---

১ ভগবদ্গীতা, ৪।৩৮

৪

ঈশ্বর

প্রতীচীর পদার্থবিজ্ঞানের গত শতাব্দীর গর্বিত গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কবি গাহিয়াছিলেন, ইহার বিজয়দর্পে 'ঈশ্বরের সিংহাসন উঠিতেছে কাঁপিয়া'। কথাটা একাধিক অর্থে সত্য। এক দিকে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিজ্ঞান অবাধগতিতে সাফল্যের সহিত তাহার অভিযান চালাইয়া যাইতেছে; সাগরের তরঙ্গ অমান্য করিয়া, আকাশের বুক চিরিয়া বিজ্ঞান মানুষকে পথ করিয়া দিতেছে। ঈশ্বরের বিশেষ অনুকম্পায় মুশা লোহিত-সাগর পার হইতে পারিয়াছিলেন; আজ ঈশ্বরের অনুকম্পা যাচ্ঞা না করিয়া আধুনিক মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতে তাহার আধিপত্য স্থাপন করিতেছে। তাহাতে আপাতত মনে হইতে পারে, ঈশ্বরের শাসন দুর্বল হইয়া পড়িতেছে।

অপর দিকে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কার প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসে নানা দিক্ দিয়া আঘাত হানিতেছে। পৃথিবী ঘুরে, এ কথা ধর্ম শিখায় নাই; ধর্মের বাধা ও শাসন অমান্য করিয়া—তাহার অত্যাচারও সহ্য করিয়া—আজ বিজ্ঞান মানুষকে ইহা বিশ্বাস করাইয়াছে। ছয় দিনে বিশ্বসৃষ্টির কথা বাইবেল বলিয়াছে। বিজ্ঞান তাহা অস্বীকার করিয়া জগতের দীর্ঘ ইতিহাস উদ্ঘাটিত করিয়াছে। পৃথিবী কূর্মের পৃষ্ঠে অবস্থিত, সূর্যের আলোকে বালখিল্য ঋষিরা খেলা করেন, ইত্যাদি কথাও ধর্মশাস্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। এ সকলও প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া বিজ্ঞান ঘোষণা করিয়াছে। এইরূপে সব দেশের সব প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের কোনো না কোনো স্থানে আধুনিক বিজ্ঞান আঘাত করিয়াছে। তাহাতেও ঈশ্বরের সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বরে, ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষে এবং ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস এই সব কারণে কম বেশি শিথিল হইয়া গিয়াছে।

গেলিলিওর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত ইউরোপে এবং অন্যত্রও গৃহীত ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কলহ চলিয়া আসিতেছে। ফলে, ধর্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়া অনেক উগ্র বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের অস্তিত্বই একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কিন্তু মানুষ এত দুর্বল, এত রকমে বহিঃশক্তির অধীন, এবং রোগ শোক ব্যর্থতা প্রভৃতিতে প্রকৃতির নিকট এত রকমে পরাজিত, এবং অনেক সময় সে নিজেকে এত অসহায় বোধ করে যে ভীত হইয়া অবশেষে ঈশ্বর-নামক শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। এক দিকে বিজ্ঞানের স্পষ্ট সাফল্য, অপর দিকে অসহায় মনের একমাত্র আশ্রয় প্রবল বিশ্বাস—এই উভয়ের মধ্যে মানুষের মন দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া যায়। এইখানে দর্শন একটা সমীচীন মীমাংসায় উপনীত হইতে চেষ্টা করে; বিজ্ঞানকে অস্বীকার না করিয়া ধর্মকেও অবহেলা না করিয়া একটা মধ্যপন্থার নির্দেশ দিতে চেষ্টা করে। এইজন্যই ঈশ্বর দর্শনের আলোচ্য বিষয়। কেহ প্রবল বিশ্বাসী, কেহ ঘোর অবিশ্বাসী; এইভাবে দ্বিধা-ভিন্ন মানব-মনের একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দর্শন করে। দর্শনের একমাত্র অস্ত্র বিচার ও আলোচনা। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের সার্থকতা ও ব্যর্থতা দেখাইয়া দিয়া সকলের গ্রহণযোগ্য একটা মীমাংসার আবিষ্কার সে এই যন্ত্রের সাহায্যে করিতে চায়। এইটি তাহার মধ্যস্থতা।

অস্তিত্ব ও স্বরূপ

ঈশ্বর আদৌ আছেন কি না, ঈশ্বর সম্বন্ধে ইহাই বড়ো প্রশ্ন।* কিন্তু ঈশ্বর বলিতে কী বুঝি, সেই প্রশ্নও একই সঙ্গে উঠে। কারণ, একপ্রকারের ঈশ্বর অস্বীকার করিলেই সব প্রকারের ঈশ্বর অস্বীকার করা হয় না। স্বীকৃতির

* ঈশ্বর এক না অনেক, তাহা লইয়া এক সময়ে বহু তর্ক হইয়া থাকিলেও এখন আর উহা তর্কের বিষয় নহে। জগতের ঐক্য হইতেই ঈশ্বরের একত্ব প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইয়া যায়। বহুবচন-বাচ্য দেবতারা এখন কাব্যে ও পুরাণে আশ্রয় পাইয়াছেন।

বেলায়ও তাহাই। প্রাকৃত জনের ধর্ম সাধারণত ঈশ্বরের যে কল্পনা করে, তাহা গ্রহণ করা বিজ্ঞানের কিংবা দর্শনের পক্ষে সম্ভব নয়। আকাশের উপরে বহু দূরে এক সুরম্য পুরীতে সান্ত্রী-পরিবৃত এক মনোহর অট্টালিকায় এক দীর্ঘশ্মশ্রু সুপুরুষ সিংহাসনে বসিয়া জগৎ শাসন করেন; চারিদিক হইতে চরেরা গিয়া তাঁহার নিকট জগতে কোথায় কী ঘটিতেছে, নিবেদন করে; সব শুনিয়া তিনি এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম আদেশ দেন; মৃত ব্যক্তিদের আত্মাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হয়; তাহাদের জীবনের ইতিহাস শুনিয়া তিনি কাহাকেও বেহেশ্‌তে আর কাহাকেও বা জেহেন্নমে পাঠান; কোনো দেশের লোকের পাপের জন্য তাহাদের দেশ বন্যার জলে ভাসাইয়া দেন; ইত্যাদি। এক সময়ে এবং এখনও লৌকিক ধর্মে—ঈদৃশ ঈশ্বরের কল্পনা আমরা পাই। তিনি স্তবে তুষ্ট হন, অন্যায় দেখিলে ক্রুদ্ধ হন; মানুষের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, এবং প্রয়োজনমতো কাহাকেও পাঠাইয়া মানুষকে ধর্মপথে চলিতে উপদেশ দেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, ঈদৃশ ঈশ্বরে আস্থা রাখা দর্শনের পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্যই ঈশ্বর আছেন কি না, এই প্রশ্নের সঙ্গে, ঈশ্বর কিরূপ, এই প্রশ্নও জড়িত হইয়া যায়।

আর দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে সব প্রমাণ সাধারণত দেওয়া হয়, তাহাতে তাঁহার শক্তি এবং গুণের কথাও আসিয়া পড়ে। সুতরাং অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকৃতিও নির্ধারিত হয়।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের একটা প্রমাণ এই যে, 'ঈশ্বর' বলিতে এমন একটা পদার্থ বুঝায় যাহার অনস্তিত্ব আমরা কল্পনা করিতে পারি না। এখানে শব্দের অর্থের সঙ্গে শব্দ দ্বারা অভিহিত বস্তুর অস্তিত্ব অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে। স্বর্ণ-গিরি কিংবা আকাশ-কুসুম আমরা কল্পনা করিতে পারি; কিন্তু তাই বলিয়া বাস্তবে ওই সব জিনিস আছে, এরূপ ভাবিতে বাধ্য হই না। কিন্তু ঈশ্বরের বেলায় তাহা নয়; অস্তিত্ব নাই, এরূপ ঈশ্বরের কল্পনা অসম্ভব।

অনেক দার্শনিকের নিকট এইটি একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে গ্রহণযোগ্য আরও প্রমাণ আছে। মানুষের পাপপুণ্যের বিচারক এবং দণ্ড ও পুরস্কারের মালিক একজন সর্বশক্তিমান আছেন, ইহা মানুষ নিজের পাপপুণ্যের অনুভূতি হইতে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয়। অনেকে বলেন, পাপের শাস্তি হইবে না, ইহা নাকি আমরা ভাবিতে পারি না। যেমনই, পুণ্যকে পুণ্য মনে করিলে ইহা অপুরস্কৃত থাকিবে তাহাও নাকি আমরা ভাবিতে পারি না। এই পাপপুণ্যের পরিপূর্ণ বিচার ইহলোকে এবং ইহজীবনেই সব সময় হইয়া যায় না। সুতরাং এমন একটি শক্তি নিশ্চয়ই আছে যে কোনো না কোনো সময়ে অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে এই বিচার করিবে। অর্থাৎ মানুষের কর্মফল-দাতা একজন আছেন। তিনি সাধারণ মানুষের মতো নন; অনেক বড়ো, সুতরাং ঈশ্বর।

জগৎটাকে একটা কার্য মনে করিলে তাহার কারণ এবং কর্তারূপেও ঈশ্বরের কথা ভাবিতে হয়। জগৎ আদিমৎ, এক সময়ে আরম্ভ হইয়াছে— অনেকে এইরূপ মনে করেন। তাহা হইলে ইহার কারণ ছিল। সে কারণ জড় পরমাণু হইতে পারে কিনা, তাহাও বিবেচ্য। বিজ্ঞানের পক্ষে ঈশ্বর না হইলেও জগতের উৎপত্তি কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু জগতে বুদ্ধির ক্রিয়ার লক্ষণ রহিয়াছে, সুতরাং কোনো বুদ্ধিমান ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, দর্শনের সাধারণত এই সিদ্ধান্ত। আর, জগৎ যদি একটা অনাদি প্রবাহ হয়, তাহা হইলেও সেই প্রবাহ রক্ষা করার জন্য একজন বুদ্ধিমানের প্রয়োজন হয়। এইভাবেও ঈশ্বর মানিতে হয়।

শক্তিমত্তা

জগৎ হইতে জগৎ-স্রষ্টার অনুমানে আমরা তাঁহার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিরও পরিচয় পাই। জগৎটা এত বিশাল ও জটিল যে, ইহাকে যে সৃষ্টি করিয়াছে তাহার শক্তি সামান্য নয়। মানুষের পক্ষে সেই শক্তির পরিমাণ

করা কঠিন; সুতরাং সেই শক্তি অসীম। ঝড়ে ভূমিকম্পে বন্যায় যখন দেশ ধ্বংস হইয়া যায়, রোগে যখন মানুষ কাতর হয়, শোক যখন অতিক্রম করিতে পারে না, সহস্র চেষ্টায়ও যখন মানুষ কার্যে বিফল-মনোরথ হয়, তখন সে ভাবিতে বাধ্য হয় যে, একটা বিপুল শক্তি তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, এবং কখনও তাহার অনুকূল, কখনও প্রতিকূল ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

বুদ্ধিমত্তা

বিশ্বে বিপুলতা হইতে ইহা অনুমান করা চলে যে, উহার কারণ একটা বিরাট শক্তি। কিন্তু শক্তি মানেই বুদ্ধি নয়। জগতের কর্তা যে বুদ্ধিমান, তাহা অনুমান করার মতো হেতুও জগতে রহিয়াছে। জগৎ-স্রষ্টা ঘুণের অক্ষর সৃষ্টির মতো দৈবাৎ এই জগৎটা সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন, এরূপ মনে না করিবার পক্ষে যুক্তি আছে। জগতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, ধাপে ধাপে কারণ হইতে কার্যের উদ্ভব, ইত্যাদি বিবেচনা করিলে মনে হইবে যে, স্রষ্টার একটা অভিসন্ধি ও অভিপ্রায় রহিয়াছে; এবং বিভিন্ন উপায় ও উপাদানের সাহায্যে একটা অন্তিম উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা তিনি করিতেছেন। সমুদ্রের জল মেঘ হয়; হাওয়া সেগুলিকে চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়; মেঘ বৃষ্টি হইয়া ভূমি সিক্ত করে; ভূমি উর্বরা হয়, ফসল জন্মায়। এই যে পারস্পরিক সহযোগিতা, ইহা যিনি ঘটাইয়াছেন তাঁহার বুদ্ধি আছে। জগতে একটা শৃঙ্খলাও রহিয়াছে। দিনের পর রাত, শীতের পর বসন্ত, শৈশবের পর যৌবন এই সব তো আবহমান কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। কিছুই তো অনিয়মে অথবা অহেতুক হয় না। আর সৃষ্টির ইতিহাসের দিকে তাকাইলেও একটা ক্রমশ সাধ্যমান উদ্দেশ্য আমাদের চোখে পড়ে। উদ্ভিদের পর প্রাণী ও তারপর মানুষ আসিয়াছে। উদ্ভিদের উপর প্রাণী এবং প্রাণীর উপর মানুষ কর্তৃত্ব করে; ইহাদের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধও রহিয়াছে। সন্তান

আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন মায়ের বুকে দুধ আসে, তেমনই কোনো প্রাণীর আবির্ভাবের পূর্বেই তাহার খাদ্য ও আবাস তৈয়ার হইয়া থাকে। এইভাবে দেখিতে গেলে জগতে বুদ্ধির পরিচয় যথেষ্টই পাওয়া যায়। সুতরাং যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি শুধু শক্তিমান নহেন, বুদ্ধিমানও বটেন।

কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি কতটুকু? সৃষ্টিতে যদি দোষ-ত্রুটি থাকে, ভুল-ভ্রান্তি দেখা যায়, তাহা হইলে সেই বুদ্ধিকে তো অসীম মনে করা চলে না। ভুল কি কোথাও নাই। একটি ফুল যেখানে ফল দিবে, সেখানে সহস্র ফুল গাছে ফুটে এবং নিষ্ফল ঝরিয়া পড়ে। ইহা অপব্যয় এবং অপব্যয় উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধি দ্যোতিত করে না। একটা পৃথিবী নির্মাণ করা হইয়াছে, তাহার কোথাও এত শীত যে প্রাণী বাস করিতে পারে না, আর কোথাও এত গরম যে একটা গাছও গজাইতে পারে না; শৈত্য এবং আতপ আর একটু বুদ্ধির সহিত বণ্টিত হইলে এই অপব্যয়টা ঘটিত না। বিচার করিলে আরও এইরকম কত ভুল জগতে দেখা যাইবে, তাহার অন্ত নাই। তাহা ছাড়া, যে কাজ এক ধাপে শেষ হইতে পারিত তাহাতে যুগযুগান্ত ধরিয়া পরিশ্রম করাও বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। অথচ সৃষ্টিতে তো তাহাই দেখা যায়। মানুষকে জগতে আনিবার জন্য স্রষ্টা যে ক্রমবিকাশের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন,— উদ্ভিদ্, কীট, পশু, বানর ইত্যাদি ধাপে ধাপে যে অগ্রসর হইয়াছেন,— তাহা তো একদিনের কাজ, সহস্র বৎসরে করার চেয়েও অধম। সুতরাং স্রষ্টার বুদ্ধি থাকিলেও সেটা খুব উচ্চদরের বুদ্ধি নয়;— অসীম সেই বুদ্ধিকে মনে করা চলে না।

সসীম ঈশ্বর

এই সব কারণে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, ঈশ্বর কাজ করিয়া করিয়া ক্রমশ হাত পাকাইতেছেন। ভুল তিনি করিয়াছেন; অনন্ত আকাশ জুড়িয়া নীহারিকা ছড়াইয়া দিয়া কয়টা বা সৌর-মণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন। আর

আমাদের এই সৌর-মণ্ডলের এতগুলি গ্রহের মধ্যে এক পৃথিবীকেই প্রাণীবাসের উপযুক্ত করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু বড়ো ইঞ্জিনিয়রের মতো তিনি নিজের ভুল নিজেই শুধরাইয়া লইতেছেন। সৃষ্টিতে তিনি লিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং ক্রমশ উন্নততর সৃষ্টি তিনি করিতেছেন। তিনি বুদ্ধিতে ও শক্তিতে অসীম নন; তবে বুদ্ধি ও শক্তি তাঁহার ক্রমশ বাড়িতেছে।

কিন্তু মানুষের প্রয়োজন, তাহার সুখ-সুবিধার দিক হইতে দেখিলেই এই সব দোষ-ত্রুটি চোখে পড়ে; তাহা নহিলে নয়। আর মানুষের কার্যপ্রণালীর মাপকাঠিতে দেখিলেই ভুল-ভ্রান্তি দেখা যায়। সমগ্র পৃথিবীটা মানুষের ভোগ্য করাই যদি উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে মেরু-প্রদেশ ও সাহারার মরুভূমি সৃষ্টি করা ভুল হইয়াছে। কিন্তু সাহারা-সৃষ্টিও যদি উদ্দেশ্যের অন্তর্গত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর ভুল কোথায়। তেমনই সীমাবদ্ধ উপাদান লইয়া যে কাজ করে, অপচয় তাহার পক্ষে বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক। মানুষ-ইঞ্জিনিয়রের পক্ষে ইট-সুরকি প্রভৃতি উপাদানের অপব্যয় নিন্দনীয়। কিন্তু যাহার অফুরন্ত ভাণ্ডার, তাহার আর অপব্যয় কী। হাজার ফুল ফুটে; সব ফুল ফল দেয় না; কিন্তু ফুলেরও তো একটা উপযোগিতা আছে। আর, হাজার ফুল ফুটাইবার মতো শক্তি ও সম্বল যাহার রহিয়াছে, তাহার পক্ষে উহা নিন্দার বিষয় হইবে কেন। যাহার সময়ের তাড়া নাই, সে ছুটিয়া পথ না চলিয়া হাঁটিয়া চলে— হয়তো বা আস্তে আস্তে হাঁটে। তেমনই, ঈশ্বরের তো আপিসের তাড়া নাই; সৃষ্টিতে মশগুল হইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি কাজ করিয়া চলিয়াছেন, তাহাতে দোষ কী। সুতরাং মানুষকে কেন্দ্র না করিয়া, সৃষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া বিচার করিলে সৃষ্টির শৃঙ্খলা, তাহার সৌন্দর্য, তাহার বিশালত্বই আমাদের চোখে পড়িবে— তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতি নয়। কাজেই ঈশ্বরের শক্তির ও বুদ্ধির যে একটা সীমা কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা ভিত্তিহীন ও যুক্তিহীন।

লীলাময় ঈশ্বর

আরও একটা কথা। জগৎটাকে একটা যন্ত্র অথবা একটা প্রবাহ, যাহাই মনে করি না কেন, উহাকে যদি একটা দূরবর্তী উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় না ভাবি, তাহা হইলে তো উহার দোষ-ত্রুটির কথাই উঠিতে পারে না। যাহা দেখি, ঠিক তাহাই যদি ভগবানের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে উহার দোষ কোথায়। যে বাড়ি তৈয়ার করিবে, তাহার পক্ষে ইটগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া কাজের ত্রুটি। যে ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য-সঞ্চয় করিবে, তাহার পক্ষে গোরুর দ্বারা ফসল খাওয়ানো, অপচয়। কিন্তু যে ইট ছুড়িয়া খেলা করে কিংবা যে গোরুকেই খাওয়ায়, তাহার পক্ষে তো ওই ওই কার্য নিন্দনীয় নয়। ঈশ্বরের সৃষ্টি— মানুষ ও তাহার সুখ-দুঃখ সমেত— যে একটা বিরাট খেলা নয়, তাহাই বা ভাবিব কেন। ঈশ্বর একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য খাটিতেছেন, তাঁহার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা আছে, অভাব আছে, তাহাই বা মনে করিব কেন। সমস্ত বিশ্বকে তাঁহার লীলা— একটা আত্মপ্রকাশ মাত্রও তো মনে করা চলে। শিশুর খেলায় যেমন কোনো উদ্দেশ্যের প্রশ্ন উঠে না ; জিনিসপত্র সে ছুড়িয়া ফেলে,— কেন বলিতে পারিবে না উহাতেই তাহার আনন্দ ; তেমনই ভগবানের এই বিশ্ব একটা লীলা মাত্র ; উহাতেই তাঁহার আনন্দ, উহাতেই তাঁহার আত্মপ্রকাশ। সৃষ্টির শৃঙ্খলা ও নিয়মের মধ্যে তাঁহার বুদ্ধি ও শক্তির প্রকাশ দেখা যায় ; ইহাই যথেষ্ট।

ঈশ্বর কি দয়ালু

সসীমই হউক আর অসীমই হউক, উৎকৃষ্টই হউক আর নিকৃষ্টই হউক, বুদ্ধি ও শক্তি যে ঈশ্বরের আছে তাহা না মানিয়া উপায় নাই। কিন্তু তাঁহার কি দয়াও আছে। জগতে এত হিংসা ও নিষ্ঠুরতা রহিয়াছে যে, ইহার স্রষ্টাকে দয়ালু বলা কঠিন। মানুষ কত রকমে কষ্ট পায়— রোগে, শোকে, অন্ন

মানুষের ব্যবহারে; ব্যক্তিগত কলহ, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ, কোনোটাই তো আনন্দের হেতু নয়। তারপর, প্রকৃতিতে— বিশেষত জীবজগতে— কত নিষ্ঠুরতাই না বিদ্যমান। এক প্রাণীকে যে আর এক প্রাণীর খাদ্য করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে, ইহাও তো একটা নিষ্ঠুরতা। কবিজন-মনোহারিণী চটুল-নয়না হরিণীকে যিনি বাঘের খাদ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি দয়ালু। এই সৃষ্টি কি অন্য রকম করা যাইত না।

এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে ইহা ঠিক যে, আপাতদৃষ্টিতে জগতে যেমন নিষ্ঠুরতা দেখা যায়, তেমনই উহাতে স্নেহমমতাও আছে, দয়াও আছে, ত্যাগ আছে এবং সৌন্দর্য ও সান্ত্বনাও আছে। মায়ের বুকের রক্ত টানিয়া শিশু বড়ো হয়; উহাতে মায়ের দেহ পলে পলে ক্ষয় পায়; কিন্তু উহাতেই মায়েরও আনন্দ, শিশুরও আনন্দ। অবশ্য, তাই বলিয়া বাঘের হাতে নিহত হইয়া হরিণীও আনন্দ পায়— এ কথা বাতুল না হইলে কেহ বলিবে না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বড়ো কবির নাটকের মতো সৃষ্টির অর্থও প্রথম অঙ্কেই ধরা পড়ে না। মানুষ আমরা কতটুকুই বা দেখিতে পাই, আর সসীম বুদ্ধি লইয়া কতটুকুই বা বুঝিতে পারি। এই জগতে আমাদের বিপদ্ আসে, কিন্তু সান্ত্বনাও আসে এবং সাহায্যও আসে। বিপদ্ যিনি দেন, উদ্ধারের পথও তিনিই দেখান; সুতরাং তাঁহাকে দয়াহীন বলা চলে না। তাহা ছাড়া, এই তো তাঁহার লীলা। সব জিনিসই আমাদের সুখদুঃখের নিক্তিতে ওজন করিলে চলিবে কেন। অনন্ত আকাশ জুড়িয়া যে বিশ্ব ছড়াইয়া রহিয়াছে, অনন্তকাল ধরিয়া যে বিশ্বের জীবন বহিয়া চলিয়াছে, তাহার মধ্যে মানুষের স্থান কতটুকু। তথাপি নিজের সুখ-দুঃখ, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই মানুষ ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ এবং পরম কারুণিক ভাবিতে শিখিয়াছে। তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি অনন্ত, করুণাও অপার।

ঈশ্বরের অবতার

দয়াময় ঈশ্বর জগতের— বিশেষত মানব-সমাজের উপকারার্থে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ভূমণ্ডলে কখনও কখনও অবতীর্ণ হন, এইরূপ একটা বিশ্বাস খুব প্রাচীন। অসীম এবং নিরাকার ঈশ্বর একটা সসীম দেহ গ্রহণ করিতে পারেন কিনা, এবং পূর্ণভাবে অথবা অংশত পৃথিবীর কোনো এক স্থানে বিচরণ করিতে পারেন কিনা, ইত্যাদি প্রশ্নের অনেক সূক্ষ্ম বিচার হইয়াছে। বিশ্বের সব কিছুই ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশ করে; যাহা বিভূতিমৎ তাহা আরো বেশি সেই শক্তি প্রকাশ করে, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি বিশিষ্ট দেহ ঈশ্বরকে বিশেষভাবে প্রকাশ করে, অবতারবাদের ইহাই অর্থ। কী ভাবে এই বিশিষ্ট অবহরণ সম্ভব হয়, তাহাই লইয়া অতীতে অনেক সূক্ষ্ম বিচার হইয়া থাকিলেও ইহা আধুনিক দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নহে।

৫

জীব, জগৎ ও ঈশ্বর

এক দিকে জীব ও জগৎ, অপর দিকে ঈশ্বর,— পরস্পর সম্পৃক্ত এই তিন বস্তুতে মিলিয়া যে মহাসত্তা হয়, দর্শনের নিকট উহাই পারমার্থিক সত্য, চূড়ান্ত তথ্য এবং পরম তত্ত্ব। ইহার মধ্যে জীব ও জগৎ যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব কি কোনো প্রকারে এই দুইয়ের উপর নির্ভর করে। সাধারণ ধর্মবিশ্বাসে এবং লৌকিক দর্শনেও অনেক সময় জীব ও জগৎকে সৃষ্ট এবং আদিমৎ মনে করা হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বর অনাদি। তাহা হইলে এমন একটা কাল ছিল যখন জীব ও জগৎ ছিল না, শুধু ঈশ্বর ছিলেন। এই একই ন্যায় অনুসারে আবার এমন

একটা কাল আসিতে পারে, যখন শুধু ঈশ্বর থাকিবেন, জগৎ ও জীব থাকিবে না। তাহা হইলে স্পষ্টতই ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে জীব ও জগতের অস্তিত্ব অপরিহার্য নয়। এরূপ কল্পনার একটা মস্ত দোষ এই যে, ইহাতে হঠাৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি করার কী প্রয়োজন হইল, তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অনাদি কাল নিষ্ক্রিয় থাকিয়া হঠাৎ তিনি সক্রিয় হইয়া উঠিলেন কেন। সেইজন্য জগৎ ছাড়া ঈশ্বরের কল্পনা অনেকেই গ্রহণ করেন নাই।

জগতের আদি ও আরম্ভের কথা দর্শনে যখন বলা হয়, তখন বর্তমান আকারের জগতের কথাই ভাবা হয়। বর্তমানে যে গ্রহনক্ষত্র-খচিত চরাচর দেখিতে পাই, ইহা এক সময় আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু জগতের আদিম উপাদান যাহা, তাহা অনাদি। স্রষ্টার জীবনে এমন একটা সময় ছিল না, যখন কোনোই সৃষ্টি তাঁহার চারিদিকে ছিল না। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। সৃষ্টি যেমন স্রষ্টা ছাড়া হয় না, তেমনই স্রষ্টারও সৃষ্টিহীন জীবন সম্ভব নয়। রূপের সঙ্গে রূপীর, গুণের সঙ্গে গুণীর, তাপের সঙ্গে অগ্নির এবং কিরণের সঙ্গে সূর্যের যেমন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যেও ঠিক তাহাই। সুতরাং ঈশ্বরের সৃষ্টি জীব ও জগৎ তাঁহার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। মাকড়সা যেমন জাল বুনে—একটা ছিঁড়িয়া যায়, আর একটা বুনে—কোনো একটা জালের আদি-অন্ত থাকিলেও তাহার জাল বুনা চলিতেই থাকে,—তেমনই স্রষ্টার সৃষ্টিক্রিয়ার বিরতি হয় না; কোনোও একটা সৃষ্টির আবির্ভাব-তিরোভাব কল্পনা করা গেলেও সমগ্র সৃষ্টির পূর্ণ আরম্ভ এবং সম্পূর্ণ বিরাম—পূর্ণচ্ছেদ—অকল্পনীয়।

জগৎ ও ঈশ্বর

ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন এবং দূর হইতে উহাকে চালাইতেছেন, এরূপ একটা কল্পনা অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। সেই অনুসারে জগৎটা একটা কম-বেশি আত্ম-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র; আপনি চলে। তবে মাঝে মাঝে খারাপ হইয়া যাইতে চায়; তখন ঈশ্বর আসিয়া অথবা তাঁহার আদেশে কোনো মহাপুরুষ আসিয়া উহাকে ঠিক পথে চালিত করিয়া দিয়া যান। কিন্তু জগৎটাকে এরূপ স্বয়ং-চালিত যন্ত্র মনে করিবার বিরুদ্ধে যুক্তি আছে। প্রধান যুক্তি এই যে, ইহাতে জগৎকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্-সত্তাবিশিষ্ট মনে করা হয়। কিন্তু তাহা সম্ভব নয়। জগতের প্রতি অণুতে, প্রতিক্ষণে, জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে, মানুষের জীবনে, সর্বত্র, সর্বক্ষণ ঈশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন। কিরণ হইতে সূর্যকে কিংবা চিন্তা হইতে চিন্তাশীলকে যেমন পৃথক্ করা সম্ভব নয়, তেমনই জগৎ হইতেও ঈশ্বর পৃথক্ হইতে পারেন না। বিশ্বেতে তিনি ওত-প্রোত হইয়া রহিয়াছেন।

জীব ও জগৎ

জগৎটা অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন—এ কথা বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনও মানিয়া লইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দর্শন মানুষের কতকগুলি অনুভূতির সত্যতাও স্বীকার করে। মানুষ ভাবে, সে কর্তা, নিজের কাজ নিজে করে; এবং যাহা করে তাহা না করিলেও পারিত; এইটুকু স্বাধীনতা তাহার আছে। স্বাধীনতা আছে বলিয়াই তাহার কৃতকর্মের জন্য মানুষকে দায়ী করা হয়। কিন্তু সমস্ত জগৎ যদি নিয়মের নিগড়ে বাঁধা থাকে, তবে সেই জগতের অধীন মানুষের স্বাধীনতা সম্ভব হয় কী করিয়া। বরং ইহাই কি সত্য নয় যে, জগতের নিয়ম অনুসারেই মানুষের মনে প্রবৃত্তি জাগে, জগতের নিয়ম অনুসারেই মানুষের দেহ সক্রিয় হয় এবং ওই একই নিয়মে কার্য ঘটিয়া

যায়। কিন্তু মানুষের কৃতকর্মে যদি তাহার স্বাধীন-কর্তৃত্ব না থাকে তবে আইনের দণ্ড ও ধর্মের শাসন, সমস্তই অর্থহীন হইয়া পড়ে। সুতরাং বাধ্য হইয়া কর্মের জন্য কর্তাকে দায়ী করিতে হয় এবং তাহার স্বাধীনতাও স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে কি মানুষের বেলায় জগতের কার্য-কারণ-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। ইহা মনে করাও কঠিন। কেহ নিয়মকে বড়ো করিয়া মানুষের স্বাধীন-কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়াছেন; কেহ মানুষের স্বাধীনতাকে বড়ো করিয়া জগতের নিয়মকে খাটো করিতে চাহিয়াছেন। আবার, কেহ কেহ উভয়কে সত্য মনে করিয়া সমস্যাটিকে মীমাংসার অতীত বলিয়াছেন। সব প্রশ্নেরই উত্তর আমরা দিতে পারিব, এমন কী কথা। আমাদের বহুমুখী জ্ঞান-পিপাসা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতৃপ্ত থাকিবেই। শেষ পর্যন্ত একটা বিরাট রহস্যের জালে অভিভূত হইয়া মানব-মন অবসন্ন হইয়া পড়িবেই। এই বলিয়া কেহ কেহ প্রশ্নটি এড়াইয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু জগতে নিয়মের রাজত্ব যতটা কঠোর মনে করা হয়, বাস্তবিকই কি উহা তাহাই। কোথাও কি অনিয়ম, অনিশ্চয়তা, অনির্দেশ নাই। সর্বত্রই কি কী ঘটিবে, বিজ্ঞান পূর্ব হইতে জানিতে পারে। ধূলিরাশিতে আলোড়ন করিলে কতকগুলি ধূলিকণা বায়ুতে ছড়াইয়া পড়িবে ঠিক; কিন্তু কোন্‌গুলি তাহা আমরা জানি কি। এমনই করিয়া নিয়মের মধ্যেও অজানা যদি কিছু থাকিতে পারে, তবে নিয়মের মধ্যে মানুষ কী করিবে, সেটা অনির্দিষ্ট থাকিতে দোষ কী।

এ ক্ষেত্রে আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত এই হওয়া উচিত যে, ব্যাবহারিক জীবনে মানুষের স্বাধীন-কর্তৃত্ব মানিতেই হইবে; তবে, উহা চরম সত্য কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

জীব ও ঈশ্বর

জগতের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ—অন্তত ভক্তের বেলায়—তাহার চেয়ে অনেক নিকট ও ঘনিষ্ঠ। ঈশ্বর যে শুধু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নয়; তিনি পিতার মতো রক্ষা করেন, অন্যায় করিলে শাস্তি দেন এবং বিপদে সান্ত্বনা দেন। তাঁহার দয়া, মমতা এবং উপচিকীর্ষার কথা ভাবিয়া অনেকে তাঁহাকে মাতৃরূপেও কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এ সমস্তই ভক্তিশাস্ত্রের কথা। দর্শনে ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ লইয়া যেসব তর্ক ও বিচার হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটা এই যে, তিনি মানুষকে পাপের জন্য শাস্তি দেন অথচ পাপ করিবার পূর্বে তাহাকে নিবৃত্ত করেন না, ইহা কি দয়ার লক্ষণ। আর, মানুষ কখন কী করিবে, তাহা যদি তিনি জানিতে না পারেন, তবে আর তিনি সর্বজ্ঞ হন কী করিয়া। হয় তিনি সর্বজ্ঞ নন, নয় তো তিনি দয়ালু :নন। উভয়থাই তাঁহার ঈশ্বরত্বের হানি হয়। এসব তর্ক অনেকটা হেঁয়ালির মতো, ঈশ্বর-তত্ত্বের আলোচ্য হইলেও দর্শনের ঠিক উপযুক্ত নয়। তথাপি দর্শনে—পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বিশেষত—এ প্রকার প্রশ্নও স্থান পাইয়াছে। ইহার সোজা উত্তর এই যে, তিনি ইচ্ছা করিয়া যদি নিজের জ্ঞান সংকুচিত করিয়া থাকেন এবং মানুষ কখন কী করিবে যদি না জানিতে চাহেন, তবে অন্যের কী বলিবার থাকিতে পারে। অথবা, যদি জানিয়াও তিনি মানুষের স্বাধীন-কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ না করেন এবং শিক্ষার জন্য পরে কৃত অন্যায়ের শাস্তি দেন, তবে তাহাতেই বা দোষ কী। পিতাও তো সন্তানকে শাস্তি দিয়া শিখায়।

প্রার্থনা

কিন্তু ইহার চেয়েও কঠিন প্রশ্ন উঠিয়াছে প্রার্থনার সার্থকতা লইয়া। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ধর্মজগতে প্রসিদ্ধ। মানুষ ঈশ্বরের কাছে রূপ চায়,

কর্তব্য। আর, প্রার্থনা করিলে, 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক' বলিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করাই সবচেয়ে বড়ো প্রার্থনা।

শেষ সিদ্ধান্ত

বিচিত্র জগতে মানুষের বাস। শুধু বিচিত্র নয়, ইহা একটি বিরাট প্রপঞ্চ। বিচিত্রভাবে সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি ও জাতি লইয়া মানব-সমাজ। মানব-সমাজ সুদ্ধ বিভিন্ন বস্তু লইয়া এই পৃথিবী; চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ও পৃথিবী, এই সমস্ত লইয়া বিশাল বিশ্ব। এই যে বিরাট প্রপঞ্চ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, এবং নিরবধি কাল ব্যাপিয়া যে চলিয়া আসিয়াছে— ইহাকে সমগ্রভাবে ভাবিলে কী সিদ্ধান্তে আমরা উপস্থিত হইতে পারি। এক অনাদি, অনন্ত, গরীয়ান্ সৎ নিজেকে নানাভাবে ব্যক্ত করিতেছে;— মানুষের দেহে মনে সমাজে, তাহার দীর্ঘ ইতিহাসে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, বৃক্ষে লতায় পুষ্পে, সুন্দর-অসুন্দর এবং সৎ-অসৎ ব্যাপিয়া সে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে; আর মানুষের মনেও সেই প্রকাশের মহিমা ধ্যান করিবার মতো শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছে। এই সৎ এক এবং অদ্বিতীয়; বহুধা ব্যক্ত, কতক ব্যক্ত এবং কতক অব্যক্ত।

৬

জ্ঞান

একটা কথা আমাদের বিচারের বাকি আছে। এত করিয়া যে দর্শনের সৌধ আমরা নির্মাণ করিয়াছি, তাহার ভিত্তি কোথায়। জানিতে চেষ্টা করিয়া একটা সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইয়াছি এবং তাহাই বিশ্বাস করিতে চাহিতেছি। কিন্তু আমাদের জানার মধ্যে কোনো গলদ নাই কি।

বাহ্য জগতের জ্ঞান আমরা কী ভাবে অর্জন করি। চোখে কত কী দেখি; কানে কত কিছু শুনি; এইভাবে ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্যে জগৎটা আমাদের

মনে তাহার একটা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। নানা রকম বস্তু চারিদিকে ছড়াইয়া আছে— আকাশে, অন্তরীক্ষে, ভূমিতে। স্থান অথবা দেশ নামক বস্তু ইহাদের সকলকে ধারণ করিয়া আছে। আবার, ইহাদের ভিতর নানা রকম ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে; সঞ্চিত মেঘ হাওয়ায় উড়িয়া যায়; নীল আকাশে সূর্যের আলো প্রকাশ পায়; সূর্য আস্তে আস্তে পশ্চিমে হেলিয়া পড়ে। এইরূপ পর পর নানা ঘটনা অনবরতই ঘটিতেছে। অনন্তকাল জুড়িয়া কত কিছু হইতেছে; কালের কোথাও তো ফাঁকা নাই। কতকগুলি আপাত-দৃষ্টিতে স্থিতিমান্ পদার্থ আর কতকগুলি ঘটনা; ঘটনার মধ্যে আবার একটা কার্য-কারণ-সম্বন্ধ; সাধারণ চোখে এই তো জগৎ; দেশ কাল জুড়িয়া কতকগুলি পদার্থ ও কার্য-কারণ সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত ইহাদেরই মধ্যে বিচিত্র সব ঘটনা।

কিন্তু এই যে দেশ কাল প্রভৃতি ধারণার সাহায্যে আমরা জগৎটাকে বুঝিতেছি, তাহাতে পারমার্থিক সত্য পাইতেছি কি। কামলা-রোগী সব জিনিসই হলদে দেখে; কিন্তু আমরা জানি, সে দেখা তাহার ভুল। সকল মানুষ যে দেশ-কাল ও কার্য-কারণের ভিতর দিয়া জগৎটা দেখে তাহাতেও তেমনই কোনো ভুল নাই তো? এমন তো হইতে পারে যে মানুষ তাহার মনের গঠন অনুসারে জগৎটাকে এক রকম দেখে— কামলা-রোগীর কিংবা চোখে রঙিন চশমা-দেওয়া লোকের মতো; কিন্তু আসল জগতের সে কিছুই জানে না।

জ্ঞানের আপেক্ষিকত্ব

দেশ ও কাল আমাদের জ্ঞানের কাঠামো। আমরা যাহা কিছু জানি তাহা কোনো জায়গায় এবং কোনো কালে ঘটে। কিন্তু এই যে দেশ ও কাল তাহা তো আপেক্ষিক, তুলনামূলক। উত্তর, দক্ষিণ, ডান বাম প্রভৃতি প্রভেদ

যে আমরা করি, তাহা তো সব সময়ই আপেক্ষিক। এমন কোনো স্থান নাই যাহা সব সময়ই উত্তর; কলিকাতার যাহা উত্তরে, চুয়াডাঙ্গার তাহা দক্ষিণে। কালের বেলায়ও তেমনই। দিন বলিয়া সনাতন কিছু নাই। ভারতের দিবা আমেরিকার রাত্রি। বৎসর বলিয়াও চির-নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নাই। নরের ষাট হাজার বৎসর ব্রহ্মার এক মুহূর্ত হউক বা না হউক, ইহা ঠিক যে পৃথিবীর এক বৎসর আর বৃহস্পতির এক বৎসর সমান নয়। উভয়ে সমান সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আসে না। বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ওই একই কথা খাটে। পৃথিবীতে এখন যাহা ঘটিতেছে— যাহা বর্তমান— গ্রহান্তরে তাহা এখনও কেহ জানে নাই— সেখানে উহা ভবিষ্যৎ। আর ধ্রুবতারা হইতে যে আলোক-রশ্মি রওনা হইয়াছে, তাহা সেখানে অতীত, পথে কোথাও বর্তমান এবং পৃথিবীতে এখনো আসে নাই সুতরাং ভবিষ্যৎ।

জ্ঞানের এই আপেক্ষিকত্ব শুধু দেশের ও কালের জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ নয়। ছোটো বড়ো গুরু লঘু প্রভৃতির জ্ঞানের মধ্যেও একটা আপেক্ষিকতা রহিয়াছে। সর্বত্র এবং সব সময়ে ছোটো কিছু নাই; তেমনই বড়োও কিছু নাই। একের তুলনায় যাহা ছোটো, অন্যের তুলনায় তাহাই বড়ো। আর, পৃথিবী হইতে এক মন চাউল চাঁদে লইয়া ওজন করিলে অনেক কম হইবে এবং বৃহস্পতিতে অনেক বেশি হইবে। এইরূপে দেখানো যাইতে পারে যে, রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি দ্রব্যের যে সমস্ত গুণ আমরা জানি, সে সমস্তই আপেক্ষিক।

জ্ঞানের এই আপেক্ষিকতার দিক্ হইতে দেখিলে মনে হইবে, সনাতন, অপরিবর্তী, চিরস্থির সত্য বলিয়া কিছু নাই। ইহাতে হয়তো দর্শন-বিজ্ঞানের জ্ঞানের সৌধ একটু কাঁপিয়া উঠিবে। শুধু পূর্ব-পশ্চিম কিংবা ডান-বাম নয়, সত্য-অসত্য, সৎ-অসৎ, ধর্ম-অধর্ম প্রভৃতিও তাহা হইলে আর সনাতন থাকিবে না। এই সিদ্ধান্ত আমরা নির্ভয়ে এবং নির্বিকারচিত্তে গ্রহণ করিতে পারি কি।

সিদ্ধান্ত যদি উহাই হইয়া দাঁড়ায় তবে আমাদের ভয় কিংবা চিত্তবিকার তো তাহা ঠেকাইতে পারিবে না। কিন্তু আসলে অত ভয়েরও কিছু নাই। পথিক পথ চলিতে চলিতে বন্ধু পায়; তাহার সব ইতিহাস জানে না, তথাপি তাহার সঙ্গ মূল্যবান্ মনে করে; হয়তো তাহাকে সাহায্যও করে এবং তাহার দ্বারা উপকৃতও হয়। খুব কম জানা একজন লোকের সঙ্গে তো পথ চলা যায়। জীবনপথেও আমরা এমনই কত সাথী সংগ্রহ করি; তাহাদের সঙ্গেই আমাদের জীবনের কারবার চলে। কেহই অন্যকে পরিপূর্ণভাবে জানে— এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারিবে না। এইরূপে অল্প জানা এবং বহু অজানা বিশ্বেতেও আমরা বাস করিয়া আসিতেছি। ইহাকে একেবারে জানি না বলিলে ভুল হইবে; 'সব জানি' বলিবার মতো শক্তিও সসীম মানবের কখনো হইবে না। বিশ্বের বিশালতা যে আমরা চিন্তা করিতে পারি, তাহার শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য যে আমাদের মনে ছায়াপাত করে, ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তাহার জ্ঞানের মধ্যে কতকটা অনিশ্চয়তা আছে বলিয়া বিচলিত হওয়া উচিত নহে। সসীম মানুষকে অসীম জ্ঞান দর্শন দিতে পারে না; তবে, যতটুকু জ্ঞান সে দেয়, তাহা সুসমঞ্জস এবং সুসংবদ্ধ; এইখানেই সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের প্রভেদ।

৭

রূপ ও অভিব্যক্তি

এই যে রূপ আমরা এতক্ষণ ধরিয়া আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা দর্শনের আধুনিক রূপ; বর্তমান জগতের অধিকাংশ দার্শনিক ইহাকে যে রূপে দেখেন, সেই রূপ। কিন্তু এ কথা বলা চলে না যে, অন্য রূপে ইহাকে কেহ কখনো দেখে নাই। বিদেহ, বারাণসী, নালন্দা, এথেন্স, আলেক্‌জান্ড্রিয়া অথবা অক্‌স্‌ফোর্ড প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে উহা ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিজেকে

ব্যক্ত করিয়াছে। বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ও হিন্দুদের মঠে ও আশ্রমেও ইহার এক এক রূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

দর্শনের যুগবিভাগ—ভারতে

দর্শনের ইতিহাস দীর্ঘ। রাজনৈতিক ইতিহাসের মতো ইহারও যুগ-বিভাগ করা যায় এবং তাহা করাও হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনে তিনটি বিভাগ সহজেই করা যায়: ১ম, উপনিষদের যুগ, ২য়, সূত্রকারদের যুগ, এবং ৩য়, ভাষ্যটীকা ও নিবন্ধকারদের যুগ। এগুলিকে শতাব্দীতে বিভক্ত করা একটু কঠিন; কারণ, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কাল নির্ণয় সব সময়ই একটা দুরূহ ব্যাপার। তবে যে কোনো শতাব্দীতেই হইয়া থাকুক, দর্শনে এই তিনটি ধাপ লক্ষ্য করা মোটেই কঠিন নয়। বেদ-উপনিষদে দর্শনের প্রথম অভিব্যক্তি একভাবে হয়। তারপর—কত পরে নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন—বেদ-উপনিষদের গদ্য-পদ্যময় সব ঋষিবাক্য আশ্রয় করিয়া যে দার্শনিক চিন্তাধারা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাকে একটা সুনির্দিষ্ট, সুব্যক্ত এবং সুসমঞ্জস রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয় বিভিন্ন দর্শনের বিভিন্ন সূত্রে। এইভাবে ষড়দর্শনের সূত্রগুলির আবির্ভাব হয়। ইহার পর দার্শনিক আলোচনা এই সূত্রগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই হইয়াছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাঁহাদের বিশিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহাদের ভাষ্যে ও টীকায়। সূত্রের ব্যাখ্যা ও বাচন অনেকেই করিয়া থাকিবেন; কিন্তু সকলেরই নাম ইতিহাসে রক্ষিত হয় নাই। যাঁহাদের দিগ্বিজয়ী মনীষা ছিল, যেমন বেদান্তে শংকর ও রামানুজ, তাঁহারাই পরবর্তী যুগে বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন। তারপর এদেশে সূত্রভাষ্য সমন্বয়ে দর্শনের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন চলিয়াছে চৈতন্যের যুগ পর্যন্ত। তখনও মধ্যে মধ্যে—চৈতন্যের শিক্ষার গুণে বিশেষত—নূতন ভাষ্যের আবির্ভাব দর্শনের নূতন অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু ক্রমে এই স্রোত মন্দীভূত হইয়া

যায়; চিন্তার অগ্রগতি ক্ষান্ত হয়। পঠন-পাঠন দ্বারা বিদ্যা রক্ষিত হইতে থাকে, এই মাত্র।

ইউরোপে

ইউরোপীয় দর্শনেও প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক, এই তিনটি যুগ স্বীকৃত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ভারতীয় দর্শনের অগ্রগতি যেখানে রুদ্ধ, ইউরোপীয় দর্শন সেখানে এখনো প্রখর বেগে অগ্রসর হইতেছে।

প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক যুগে দর্শনের চিন্তাধারার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য থাকে। কিন্তু এক যুগ হইতে অন্য যুগে পৌঁছিতে চিন্তাধারার সূত্র একেবারে ছিন্ন হইয়া আকস্মিক ভাবে নূতন চিন্তা আরম্ভ করিয়া দেয় না। যুগ হইতে যুগান্তরে চিন্তাস্রোত যে চলিতে থাকে, তাহার সেই গতিও লক্ষ্য করা যায়। মানুষের ইতিহাসে—তাহার ধর্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে, অর্থনৈতিক জীবনে—কত সব ছোটো বড়ো ঘটনা ঘটিতেছে। এই সকলের কোনো একটাকে আশ্রয় করিয়া দর্শনের চিন্তা ক্রমশ রূপান্তর পরিগ্রহ করে। প্রাচীন গ্রীসের দর্শনে যখন খ্রীস্টানধর্মের আলোক পড়িল, তখনই তাহার রূপ আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। নূতন প্রশ্ন, নূতন জিজ্ঞাসা, নূতন বিশ্বাস ও নূতন আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে দেখা দিতে লাগিল। প্রাচীনের দেবময় জগতে একেশ্বর প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ধর্মের ধারা—পূজা, পার্বণ, আচার ইত্যাদি আস্তে আস্তে বদলাইতে লাগিল। দার্শনিকের মনও এ সমস্ত হইতে মুক্ত থাকিতে পারিল না। তাই নূতন জাতীয় দর্শন আসিল:—খ্রীস্টান দর্শন গ্রীক দর্শনের স্থান অধিকার করিল।

তারপর বিজ্ঞান ও ব্যবসায় প্রায় একই সঙ্গে ইউরোপের জীবনে আর একটা ঢেউ তুলিয়া দিল অতীতের ইমারতে আবার ভাঙন ধরিল। নূতন আলো, নূতন আশা, নূতন বিশ্বাস মনের আকাশ ছাইয়া ফেলিল। সমাজে যাহারা ছোটো ছিল তাহারা বড়ো হইল; নূতন লোকের হাতে নূতন ক্ষমতা অর্পিত

॥ ১৩৫০ ॥
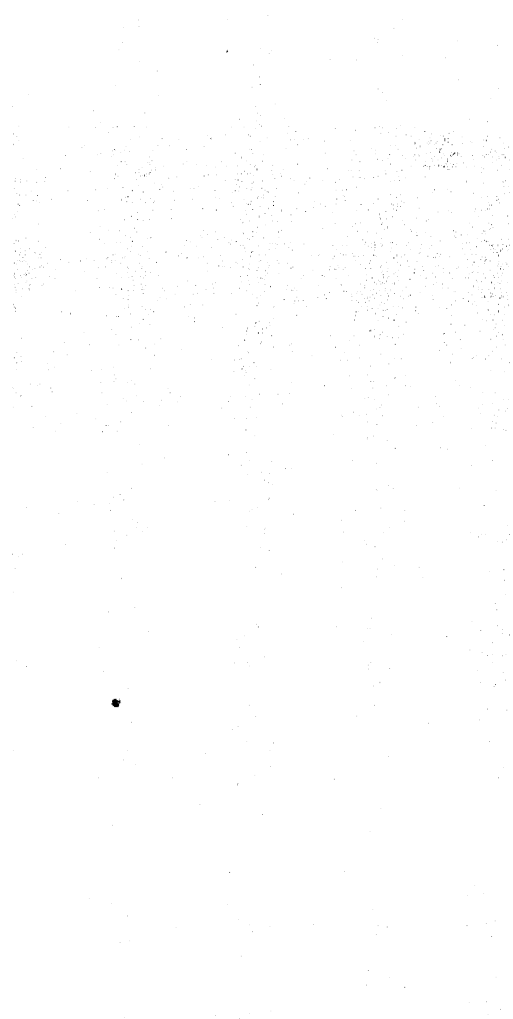
১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ